কাকতালীয়

পুষ্পিতা জামান রিদি

বাংলা সাহিত্য আন্দোলন

১৪

কাকতালীয়

পুষ্পিতা জামান রিদি

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা-২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদুল্লাহ বিন মোস্তফা

প্রকাশক
মুহাম্মদুল্লাহ বিন মোস্তফা
বাংলা সহিত্য আন্দোলন
গোবিন্দগঞ্জ নতুন বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ-৩০৮৪।
মোবাইল: ০১৮৫১৭০৪৯৭৮

মূল্য: ১৫০৳

Kaktalio
By Pushpita Jaman Ridi
Published By Bangla Shahitya Andolan
ISBN: ....
Price: 150৳

প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে এই বইয়ের কোনো অংশ ফটোকপি, পুনঃমুদ্রণ বা কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে খুজে পাওয়া কি সত্যিই খুব কঠিন? কঠিনতম কাজ ভেবে নিয়ে খুজে পাওয়ার আশাও মানুষ ছেড়ে দেয়। যদি এতই কঠিন হতো তাহলে কী করে কোন চেষ্টা ছাড়াই সেই মানুষগুলো আমাদের সামনে এসে হাজির হয়? বিষয়টা কি সত্যিই পুরো কাকতালীয় নাকি এর পেছনে অন্য কোন কারন আছে?

• ৯ই জানুয়ারি ২০১৫

সুভা পুরো ক্লাসের মধ্যেই বেশ চঞ্চল ধরণের মেয়ে। স্কুলের সবাই প্রায় তাকে এক নামে চেনে। তৃতীয় তলায় গিয়ে সুভার নাম বললেই সকলে তার ক্লাসরুম টা দেখিয়ে দেয়। বলা যায় তার নামেই পুরো ক্লাসটা পরিচিত। বাবা মা নাকি ভেবে রেখেছিলেন ওর নাম রাখবেন শুভ তবে ছেলের বদলে মেয়ে হওয়ায় নামটা বদলে সুভা হয়ে গেল। তবে নামের সাথে তার স্বভাবগুলো অবশ্য বদলায়নি। একজন ছেলের আচরণ যেমন হয় সুভার আচরণও ঠিক তেমন। স্কুলে মেয়েদের পোষাক পরলেও তাকে দেখে মনে হয় কেউ বুঝি একজন মেয়ের শরীরে ছেলের মাথা বসিয়ে দিয়েছে। তার চুলগুলো এতোই ছোট করে কাটা যে কাধ স্পর্শ পর্যন্ত করে না। দেখতে বেশ ফর্সা নয়। সবকিছু ছেলেদের মতন হলেও চাইলেই তাকে মেয়ে বানানো মোটেও কঠিন কাজ হবে না। স্কুল বাদে পুরোটা সময়ই সুভা ছেলেদের পোষাক পড়ে। দেখে বোঝার উপায় নেই সে একজন মেয়ে। স্কুলে যাওয়ার মূল উদ্দ্যে লেখাপড়া হলেও সুভার জন্য তা ভিন্ন।

স্কুল তার কাছে ঘুরতে যাওয়ার একটা স্থান মাত্র। নবম শ্রেণীর ছাত্র নামক ছাত্রী হলেও তাকে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী বললেও অবিশ্বাসের কারন নেই। এই বয়সেই সুভা তার থেকে অনেক উপরের পর্যায়ের মানুষের সাথে চলাফেরা করে। তবে সে খুব হাসিখুশি। এমন হাসিখুশি মেয়ের সাথে থাকলে সকলেই ভালো বোধ করে। সুভা ক্লাসে ডুকলেই তাকে ঘিরে ছোট খাটো একটা ভিড় জমে যায়। সেও এই বিষয়টা বেশ পছন্দ করে। তবে আজ ক্লাসে আসে তো কাল আসে না এই হলো সুভার এক বড় সমস্যা। মূলত এই স্কুলের জায়গাটা সুভার বাবার। এই জায়গায় অন্য এক ব্যক্তি স্কুলটা নির্মান করেছেন। সুভার বাবার প্রভাবের ফলে সে স্কুলে না আসলেও তাকে তেমন কিছু বলা হয় না। পিতার ক্ষমতার প্রভাব তার শিক্ষা জীবনেও পরেছে। সুভার বাবা ব্যস্ত মানুষ হওয়ায় এসব নিয়ে তার মাথা ব্যাথা কম। বেশ কিছুদিন পর আজ সুভা স্কুলে এসেছে। রোজ দিনের মতো আজও তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়। আজ অবশ্য স্কুলে আসার একটা কারণ আছে, আজ তাদের নতুন শ্রেণীর বই দেওয়া হবে। পড়াশোনায় মন বসুক বা না বসুক সুভা স্কুলে গেলেই সামনের সিটে বসে। দেখে মনে হয় এটা তার জন্মগত অধিকার। নয়টা থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। আরো ২০ মিনিট বাকি। ঘড়িতে যখন ঠিক ০৮:৫৬ বাজে তখন রোগা পাতলা, শ্যাম বর্ণের একজন ছেলে ক্লাসের সামনে উপস্থিত হলো। তার পরনে স্কুলের পোশাকের বদলে বাইরের পোষাক, ঘাড়ে কোনো ব্যাগও নেই। সে কোনো কথা বা দৃষ্টি ছাড়াই সোজা ক্লাসে ঢুকে চতুর্থ নম্বর সিট টাতে বসে পরল।

নতুন ছাত্র হলেও ঘাড়ে অন্তত একটা ব্যাগ থাকবে এই ছেলেটির কাছে তাও নেই। ক্লাসে সকলের দৃষ্টিই মোটামোটি এই অদ্ভুত ছেলেটির উপর। ছেলেটি ক্লাসে ঢোকার পর বাকি ৪ মিনিট ৪ সেকেন্টের মতো কেটে গেল।

প্রথম ক্লাসটা বাংলা। ক্লাস বাংলা হলেও স্যারের মধ্যে বাংলার ভাবটা বেশ কম। ক্লাসে ঢুকেই সে দু চারটে ইংরেজি বলে ফেলে। আজও প্রতিবারের মতো সেই বিখ্যাত বাংলা শিক্ষক বলে ফেললেন 'গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ" কথাটা শুনলেই মনের ভেতর থেকে বাংলার স্বাদটা চলে যায়। শুধু কথাতেই ইংরেজি হাবভাব তা নয় আচরণ, পোষাক, অঙ্গভঙ্গিতেও তাই। তিনি সর্বদা ইন করে শার্ট পরেন সাথে টাই। একদম বিদেশি সাহেব। ক্লাসে ঢুকেই তার ইংরেজি বাণীর পর তিনি বললেন 'আজ তোমাদের রোল কল করার আগে নতুন স্টুডেন্টসদের দেখতে চাই যারা নতুন এসেছো সকলে দাড়াও" কথাটা শোনার ১০ সেকেন্ডের মধ্যে ক্লাসে প্রায় সাতজন শিক্ষার্থী দাড়িয়ে গেল। তার মধ্যে সেই রোগা পাতলা ছেলেটাও আছে। স্যার একজন একজন করে সবার নাম, ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। প্রথমেই একজন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন। তার নাম প্রেমা, সে থাকে সামনের চার নম্বর রোড়ে। এরপর আরো একজন মেয়ে নাম রিয়া। স্কুলের এটা বিল্ডিং পরেই তার বাসা। এরপর জিজ্ঞেস করলেন একটা ছেলেকে। তার নাম শান্ত তবে দেখে মোটেও মনে হলো না সে শান্ত। তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল 'এই সামনে ডানে গিয়ে বাম পাশেই আমার বাসা '। এমন উত্তরে স্যার কিছুটা বিরক্ত হলেন। এরপর প্রশ্ন করা হলো সেই অদ্ভুত ছেলেটাকে। তার নাম নীল, নামটা শুনলেই কেমন একটা শান্তি কাজ করে মনে। নামের মধ্যে নীল শব্দটা থাকলে নামের সুন্দর্য বেড়ে যায় বলে মনে হয় সুভার। নীলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে স্যারই কিছুটা বোকা বনে গেলেন। স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমার বাসা কোথায় আর সে উত্তর দিল 'আমার কোনো বাসা নেই, বাড়িওয়ালার বাসায় ভাড়া থাকি'। নীলের এমন উত্তরে প্রায় পুরো ক্লাস তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। স্যার কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে আবার বললেন 'ঐ বাড়িওয়ালার বাসাটা কোথায়' এবার নীল সুন্দর মতোই বলল 'ব্লক বি, ২ নম্বর রোড, ৩৫ নম্বর বাসা' স্যার এতো সুন্দর উত্তরেও ঠিক খুশি হলেন না। তবে সামনের বেঞ্চ থেকে সুভা খুব অবাক হয়ে তাকাল। কারণ ব্লক বি, ২ নম্বর রোড, ৩০ নম্বর বাসাটা সুভাদের তবে সুভা আগে কখনো তাকে দেখে নি। সুভা কিছু ভাবার আগেই স্যার বাকি সবার নাম, ঠিকানা নিতে শুরু করলেন। নাম, ঠিকানার পর্ব শেষ হতেই রোল কল করে ক্লাস শুরু করা হলো। প্রায় ৩০ মিনিট স্যারের বকবকানির পর

অবশেষে ক্লাস শেষ হলো। বাংলার মাঝে ইংরেজি মিশ্রিত থাকলে বাংলার ভাব হৃদয়ে জাগিয়ে ওঠানো কঠিন হয়ে যায়।তাই এই বাংলা শিক্ষকের ক্লাসে কেউই বেশ একটা গুরুত্ব দেয় না। বাংলা ক্লাসের পর গণিত। গণিত ক্লাসটা ভালো মতোই পার হয়ে যায়। গণিতের শিক্ষক হিসেবে আজমল স্যার বেশ ভালো। এর পরই আর্টস এর শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে অপ্রিয় বিষয় বিজ্ঞান ক্লাস। এই স্যারের অবস্থাও বাংলা স্যারের মতো। বিজ্ঞান শিক্ষক হলেও জ্ঞান বলতে কিছুই নেই তার। তার নাম ইকবাল। ক্লাসের সবাই তাকে 'ইক' বাদে বাকি অংশে ডাকে, তবে সে বিষয়ে ইকবাল স্যার মোটেও অবগত নন। তিনি যতই খারাপ পড়াক না কেন তার ক্লাসে পুরো মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় কারণ ইচ্ছে না থাকলেও পুরো ক্লাসকে তার পড়ানোর সময় সম্পূর্ণ চুপ করে থাকতে হয়। যদি কেউ তার পড়ানো না শোনে বা মন অন্য কোথাও দেয় তাহলে তার আর রক্ষে নেই। দাড় করিয়ে প্রায় পুরোটা বই পড়া ধরতে শুরু করে দেন। ইকবাল স্যারের চোখে সমস্যা হলেও তার চশমাটা বোধহয় সব কিছু দেখার ক্ষমতা দুই গুন করে দিয়েছে বা অন্য লোকের মাথায় কি চলছে সেটা পড়ে ফেলার ক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছে। কারো মন পড়ায় না থাকলেই সে ধরে ফেলেন। এ তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা। ক্লাসের শুরু থেকেই নীল নামের ছেলেটি বেশ অন্যমনস্ক। সেই ক্লাসে ঢোকার থেকে এখন পর্যন্ত, এই বিষয়টা আর কেউ খেয়াল না করলেও ইকবাল স্যার ঠিকই খেয়াল করলেন। বেচারা জানেও না আজ কি বিপদ আছে তার কপালে। এরই মাঝে হুট করে ইকবাল স্যার চশমার ফাকা দিয়ে নীলের দিক তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠে বললেন' স্কুলে কি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে এসেছো'। নীল এতোটাই অন্যমনস্ক ছিল যে স্যারের কথা তার কান দিয়ে গেল না। স্যার এবার আরো জোরে চিৎকার করে বললেন 'এই বেয়াদব ছেলে, কথা কানে যায় না' এবার নীল স্যারের দিক তাকাল,তবে তাকে দেখে একটুও ভীত মনে হচ্ছে না। এই জায়গায় অন্য কেউ থাকলে বোধ হয় ভয়ে কেঁদেই ফেলত। নীল স্যারের দিক তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল

-জ্বি স্যার, আমাকে বলছেন?

-তুমি ছাড়া কি আর কেউ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে?

-সেটা তো খেয়াল করিনি।

-তোর তো খুব সাহস, আমার মুখে মুখে কথা বলিস।

-কথা তো মুখে মুখেই বলে স্যার। অন্য কিছু দিয়ে কি কথা বলা যায়?

-নতুন এসে এতো সাহস, দাড়া আজ একটা পড়া না পারলে তোকে পুরো ১০০ বার স্কুলের মাঠে ঘোরাব।

-কি প্রশ্ন করবেন, করতে পারেন স্যার।
-তুই নিশ্চিত তুই পড়া পারবি? নতুন এসেও এতো কনফিডেন্স।
- আগে প্রশ্ন করুন। না পারলে শাস্তি মেনে নিব।
-বল, পৃথিবীতে মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কতো?
স্যারের এমন প্রশ্ন শুনে পুরো ক্লাস মাথা চুলকাতে শুরু করল। সব শিক্ষার্থীরাই মাত্র নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন কোনো শব্দই আজ পর্যন্ত তারা শোনেও নি আর তার উত্তর জানা তো দূরের কথা। তার উপরে আর্টসের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞান কিছুটা কম থাকে। পুরো ক্লাস এখন নীলের শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় নীল খুব শান্ত ভাবে বলল
-৯.৮৩২ ms -1
উত্তরটা নীল এমনভাবে বলল যেন এর থেকে সোজা প্রশ্ন আর হয় না। ক্লাসের সবার সাথে স্যারও পুরো অবাক হয়ে গেলেন। স্যার এবার আরো রেগে গিয়ে নীলকে এমন এক প্রশ্ন করলেন যা সম্ভবত নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইতেই নেই, তিনি বললেন
-নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কত সালে অবিকৃত হয়? -১৬৮৭ সালে।
নীল উত্তর গুলো দিতে দু সেকেন্ডের বেশী সময় নেয় নি। স্যার এর পর নীলকে আরো কঠিন কঠিন ৩টে প্রশ্ন করলেন যার প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই সবার মাথার উপর দিয়ে গেল। ইকবাল স্যার কোনো ভাবেই নীলকে থামাতে না পেরে কিছুটা লজ্জা আর বিরক্তি নিয়ে চেয়ারে বসে পরলেন। প্রায় ১, ২ মিনিট পুরো ক্লাস নিরব। নিরবতা ভেঙে স্যার বললেন,
-এই তোর নাম কি?
-নীল।
-তোর তো এই ক্লাসে না থেকে সাইন্সের ক্লাসে থাকা উচিৎ।
নীল কোনো কথা বলল না।
-বোস, আর ক্লাসে মন দে।
এই পুরো ঘটনাটা ক্লাসের বাকি শিক্ষার্থীদের থেকে বেশী মন লাগিয়ে দেখছিল সুভা। নতুন ধরণের ঘটনা দেখা সুভার প্রিয় কাজের মধ্যে একটি। বিজ্ঞান ক্লাসে আর তেমন কোনো পড়াশোনা হলো না। স্যার চুপ করে প্রায় ২০ মিনিট কাটিয়ে দিলেন। পুরো বিষয়টা হজম করতে স্যারেরও কিছুটা সময় লেগে গেল। বিজ্ঞান ক্লাসের পরেই টিফিন। টিফিন ব্রেক শুরু হতেই সবাই ছোটাছুটি শুরু করল। শুধু নীল চুপচাপ বসে আছে। সুভা নীলের সাথে কথা বলার জন্য যেতেই তার বন্ধুরা তাকে প্রায় ধরে বেঁধে মাঠে নিয়ে যেতে চাইল। সে কোনো মতে সবাইকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে

দিল।প্রথমে একটু ইতস্তত বোধ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা কাটিয়ে উঠল সুভা। হাতে টিফিনের বক্স আর পানির বোতলটা নিয়ে নীলের বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল সে।বেঞ্চে গিয়ে বসার পরও নীল কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। সে এক মনে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। এমন ভাবেই তাকিয়ে আছে যে তার পাশে কেউ এসে বসেছে সে তা টেরও পায়নি। নিরবতা ভেঙে সুভাই বলল

-হাই আমি সুভা।

এই বলে সুভা নীলের দিকে হাত বারিয়ে দিল। নীল সুভার দিক তাকিয়ে হাত না মিলিয়েই বলল।

-বাহ্, সুন্দর নাম।

-তোমার নাম কি?

-প্রথমে তো নাম, ঠিকানা বলার সময় বললামই।

-ও হ্যাঁ, তোমার ঠিকানা শুনেই তো তোমার সাথে কথা বলতে আসা।

-কেন ঠিকানায় কি সমস্যা?

-আসলে তোমার বাসার পাশেই আমার বাসা, কিন্তু তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।

- আমরা নতুন এসেছি।

- ও আচ্ছা এই জন্যই।

একা একা কথা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই ঝামেলার ব্যাপার। বিপরিত দিক থেকে কথা বলার কোনো আগ্রহ না থাকলে জোর করে বেশীক্ষন কথা চালিয়ে যাওয়া যায় না। সুভা আরো কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু বলে উঠতে পারল না। সভা আর নীলের এই কথোপকথেনর মাঝেই হট করে টুকটুকি এসে নীলকে প্রশ্ন করল

– এই ছেলে তুমি কিভাবে এতো অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর পারলে? স্যারদের এসব প্রশ্ন তো আমার মাথার উপর দিয়ে যায়।

টুকটুকি সব সময়ই এমন ভাবে কথা বলে। একজন মানুষের সাথে প্রথম পরিচয় কিভাবে কথা বলতে হয় তা টুকটুকির জানা নেই। টুকটুকি দেখতে মোটেও টুকটুকে নয়। রোগা, কালো, বকের মতো লম্বা, সাথে একটা চশমা। শুনেছি ভালো ছাত্রীরা চশমা পরে তবে তার ক্ষেত্রে সেটা ভিন্ন। টুকটুকি আর সুভার বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়। তার এমন প্রশ্ন শুনে সুভা বলল

– এমন ভাবে কেউ প্রশ্ন করে নাকি?

– যা জানতে চাই সেটাই তো জিজ্ঞেস করলাম ভুল কি করেছি।

নীল বলল,

– ঠিকই তো বলেছো। বারতি কথা না বলে দরকারি প্রশ্ন করাই ভালো।

নীলের এমন কথা শুনে সভার একটু সময়ের জন্য মনে হলো নীল বুঝি বারতি কথা বলতে এতক্ষণ সুভার কথা গুলোকেই বুঝিয়েছে। হঠাত সুভার মন খারাপ হয়ে গেলেও সে নিজের টিফিন খেয়ে চলেছে। এতক্ষণে তার টিফিন প্রায় শেষও হয়ে গেছে। টুকটুকি আরো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল

- বলোনা কিভাবে পারলে, তুমি কি আগেও এই ক্লাসে পরেছো নাকি?

- না না তেমন কোনো ব্যাপার না। ঐ বিজ্ঞানের কিছু উপরের পর্যায়ের বই পরেছিলাম। ওখান থেকেই জানা

- তুমি তাহলে আর্টসে কি করছ। সাইন্স গ্রুপে চলে যাও।

- চলে যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়।

নীলের এমন উত্তরে আর কেউ কোনো কথা বলল না। সুভা কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাবে তখনই টুকটুকি সুভাকে টানতে টানতে মাঠে নিয়ে গেল। এমন ভাবেই টানতে লাগল যে সুভার পানির বোতলটা মাটিতে পরে এক পাশে টোপ খেয়ে গেল। নীল খুব মনযোগ দিয়ে সেই সুন্দর বোতলটার টোপ খাওয়া দেখতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টুকটুকি তার মনযোগ নষ্ট করে দিল। সে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলে উঠল

- আর নীল আমার নাম টুকটুকি। বিজ্ঞান না বুঝলে মাঝে মাঝে সাহায্য কারো।

এই বলে টুকটুকি সুভাকে মাঠে নিয়ে চলে গেল।

টিফিন শেষ হওয়ার পর আরো ২টো কঠিন বিষয়ের ক্লাস আর একটা সহজ ক্লাস। সহজ ক্লাসের সময়টা সুভা নীলের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে ভেবেই কটিয়ে দিল।

বৈশাখ মাস চলছে না যখন তখন বৃষ্টি হওয়ার কথাও না। স্কুল ছটির প্রায় ১০ মিনিট আগে থেকে বৃষ্টি শুরু হলো। দেখে মনে হয় সবাইকে বুঝি বাড়ি যেতে বাধা দিতে চাচ্ছে এই বৃষ্টি। হালকা বাতাস দিয়ে বৃষ্টির শুরুটা হয় এর পর একদম ঝড়। সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকায় কেউই ছাতা আনে নি। কেউ কেউ এনেছে, তারা যে যার ছাতা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। । বৃষ্টির মাস ছাড়া বুদ্ধিমান লোকেরা ছাতা সাথে আনে না। তাই সুভা ভাবত যারা সবসময় ছাতা সাথে রাখে তারা হয়তো বোকা আর সে খুব চালাক তবে আজ সকল বুদ্ধিমান লোককেই এই বৃষ্টি বোকা বানিয়ে দিয়েছে। নিজের এতদিনের চিন্তা ধারনা ভুল প্রমাণিত হওয়ার পরেও বেশ খুশি মনেই স্কুল থেকে বের হচ্ছিল সুভা। হঠাৎ দেখতে পেল আকাশ স্কুলের দরজার সমনে মুখ কালো করে দাড়িয়ে আছে। আকাশের সাথে সুভার বেশ ভালো বন্ধুত্ব। সুভা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল। -কিরে, বাড়ি যাবিনা?

-বৃষ্টি না থামলে কেমন করে যাবো।

-আমি যেভাবে যাচ্ছি। ভিজে ভিছে।
-আমি ভিজে যেতে পারব না, রাস্তার লোকে দেখলে কি বলবে।
-আরে কিছু বলবে না, চলতো আমার সাথে।
-না তুই যা। বৃষ্টি না থামলে আমি কিছুতেই যাব না।
-তাহলে আরো ১-২ ঘণ্টা দাড়িয়ে থাক। আমি গেলাম।

এই বলে সুভা হাঁটতে লাগল। আকাশের মতো ছেলেদের বোধ হয় ছেলে বলে না।মানুষের মতে লজ্জা নারীর ভূষণ, আর এই স্কুলে লজ্জা আকাশের ভূষণ। পৃথিবীতে যত লজ্জা একমাত্র আকাশকেই সৃষ্টি কর্তা দিয়েছেন। সুভা বৃষ্টি মাথায় করেই স্কুল থেকে বের হলো। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় লোক কম। স্কুলের দরজাটা পার হতেই সুভা নীল কে দেখতে পেল। সেও সুভার মতো ভিজে ভিজে যাচ্ছে। তাহলে নীল বোধ হয় আকাশের মতো এমন লাজুক না। সুভা নীলকে দেখতে পেয়ে তার কাছে যেতে যেতে পেছন থেকে নীলের নাম ধরে ডাকলেও নীল তা শুনতে পাচ্ছে না বা শুনতে চাইছে না। তবুও সুভা হাল ছাড়ল না। দৌড়ে গিয়ে নীলের পাশে দাড়িয়ে বলল।
-বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি যাচ্ছো। বাসায় কেউ বকবে না? -আমাকে কেউ কিছু বলে না।
-তুমিতো তাহলে খুব লাকি। আমি বৃষ্টি তে ভিজলেই বাবা বকাবকি করে, তাও আমি বাবার কোনো কথা শুনি না।
এই বলে সুভা উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল। সুভার হাসি দেখে নীলও ভদ্রতা দেখিয়ে একটু হাসল। সুভা আবার শুরু করল
-তোমার বাসায় কে কে আছে?
-মামা-মামি, দুটো মামাতো ভাই।
-তোমার বাবা-মা?
-নেই।
-ওহ, সরি, আমি বুঝতে পারি নি। যদিও তোমার আর আমার কিছুটা মিল আছে। আমারও মা নেই,কোনো ভাই-বোনও নেই, শুধু বাবা আর আমি। আমার মাকে আমি দেখিও নি। আমার জন্মের সময়ই তিনি মারা গেছেন। আর বাবা সব সময় ব্যস্ত। সারাক্ষন একা একাই থাকি।

সুভার এসব বকবকানি হতে হতেই নীলের বাড়ি এসে গেল। ওর বাড়িটা আগে। এর একটু পরই সুভার বাড়ি। বৃষ্টি এখনো থামেনি, হালকা হালকা হচ্ছে। নীলের বাড়ি

আসতেই সে কোনো কথা না বলেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পরল। সুভা যেতে যেতে চিৎকার করে বলল 'মাঝে মাঝে তোমার বাসায় আসলে ঢুকতে দিও'
সুভার কথা শুনে নীল কিছুটা ভয় পেল সাথে একটু সংকোচ বোধ। দুজন দুজনের বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেল। বাড়ির দরজার সামনে আসতেই সুভার হঠাৎ মনে পরল। সে তো নিজ থেকে লোকের সাথে সেধে কথা বলার মানুষ না। স্কুলে সবাই নিজ থেকে আগে তার সাথে কথা বলে। তাহলে কেন সে বার বার নিজ থেকে নীল এর সাথে কথা বলতে চাইছে। কারণ টা ভাবার আর সময় পেল না সে। শরীর ভিজে চুপ চুপ করছে। এক্ষনি ঘরে গিয়ে গা না মুছলে নির্ঘাত ঠান্ডা লাগবে।

সুভা সারাক্ষণই বাসায় একা। ঠিক একা নয় বাড়িতে মানব জাতির কেউ না থাকলেও একটা কুকুর থাকে। তার সবসময়ের সাথী কুকুরটির নাম পমি। বাবার পরেই সুভার সব থেকে আপন সে। বাড়িতে সকালে বুয়া এসে রান্না করে যায় তাতেই দিন চলে যায় আর রাতে বাবা এসে রান্না করে মাঝে মাঝে। তার বাবা সময় না দিলেও মেয়েকে অবশ্য খুব ভালোবাসেন। বাড়ি ফেরার সময় মেয়ের পছন্দের খাবার নিয়ে আসে। সুভাকে বেশ কিছু টাকাও দিয়ে যায় হাত খরচ বাবদ। এতো ভালোবাসার পরও বাবার সাথে কোথাও একটা মিল নেই তার। তারা দুজনের কেউই কাউকে নিয়ে খুব একটা ভাবে না। বাবা-মেয়ে যে যার মতন থাকে। সুভাও অবশ্য সারাদিন খুব ব্যস্ত স্কুল, পড়াশোনা, নাচ শেখা, ক্যারাটে শেখা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া আর সব থেকে বড় যেই কাজ সেটা হলো তার আশপাশের ১০ বাড়ির মানুষের যে কোনো বিপদে সাহায্য করা। এসব করতে করতেই তার দিন কেটে যায়। আর বন্ধুরা তো আছেই টুনটুনি, আকাশ, বেলী, রোহান, ফাহাদ, রবি এই হলো সুভার ছোট খাটো একটা বন্ধুর দল। মন খারাপ লাগলে বা একা একা লাগলেই তাদের ফোন করা যায়। সুযোগ পেলেই তারা চলে আসে। বাড়ি তো সব সময় ফাকাই থাকে তাই সবাই এই বাড়িতে আসতেও খুব আনন্দ পায়। আজও সুভার তেমনই একা লাগছে। বৃষ্টি হওয়াতে সবটা আরো বিরক্তিকর হয়ে গেছে। তার কাছে সব সময় একটা ফোন থাকে। বাড়িতে একা থাকলে সুরক্ষা হিসেবে একটা ফোন লাগেই। আজ ফোন করাতে আকাশ বাদে সবাই এসে পরল। আকাশকে ফোন করাতে সে যে বলল 'এই বৃষ্টির মধ্যে আমি কিছুতেই বাড়ির বাইরে যাব না'। সুভাও আর জোর করল না। কারণ জোর করে লাভ খুব একটা হবে না তা সুভা ভালো করেই জানে। মিনিট বিশের মধ্যেই সবাই সুভার বাড়িতে এসে গেল। বাড়ি ফাকা

ফলে বিরক্ত করারও কেউ নেই। যাই করা হোক কেউ তাদের কিছু বলবে না। সুভার বন্ধুদের মধ্যে বেশ ভালো একটা বন্ধন। যদিও তাদের বন্ধুদের মধ্যে কারো সাথেই কারো মিল নেই। যেমনঃ ফাহাদ দেখতে বেশ মোটা আর কালো, পড়াশোনা একটু আধটু করে। তার একটা বড় সমস্যা হলো এই যে, সে যে কোনো কথা মুখের উপর বলে দেয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যাক একদিন তার এলাকার একজন মোটা দেখতে আন্টি ফাহাদকে এসে বললেন 'তুমি তো বেশ মোটা হয়ে গেছো।' ফাহাদ মুখের উপর বলে দিল 'আপনি তো আমার দুগুণ মোটা।' এই নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়েছিল। এমন ঝামেলা প্রায়ই হয়। অন্যদিকে আকাশ তো লজ্জায় মুখের ওপর কথা বলা দুর মুখের পেছনেও কথা বলে না। আবার রোহান সর্বদা ভেবে চলে কি করলে তাকে সুন্দর লাগবে। সবাই তাকে হিরো ভাববে। সে অবশ্য দেখতে আসলেই সুন্দর। এই বয়সেই বড়দের মতো বডি বনিয়ে ফেলেছে। ভাবখানাও দেখায় বেশ বড়দের মতন। তাকে মানায়ও অবশ্য এতে। টুকটুকি আবার খুব সাধারণ। সব দিকেই মোটামুটি ঠিকঠাক। তবে বোকা বোকা কথা বলা তার জন্মগত রোগ। এতে কারো তেমন কোনো ঝামেলা হয়না। বোকা মানুষের আশে পাশে থাকলে অবশ্য একটা লাভ আছে। নিজেকে খুব চালাক মনে হয় সেই মজাটাই সবাই ওর সাথে নেয়। একমাত্র বেলী আর রবির মধ্যে মিল আছে। তারা দুজনেই বেশ পড়ুয়া, একদম ভদ্র সমাজের ভদ্র ছেলে মেয়ে যাকে বলে। তাদের চেহারাতেও মিল । কিন্তু বেলী আর রবির মধ্যেই ঝামেলা বড্ড বেশী। একটা না একটা কিছু নিয়ে লেগেই থাকবে। আর সুভা তো সকলের থেকে আলাদা। মেয়ে হয়েও সে ঠিক মেয়ে নয়। সুভাদের এই বন্ধুত্ব দেখলে বোঝা যা বিজ্ঞানীরা কেন বলেছিলেন বিপরীত ধর্মী পদার্থ একে অপরকে আকর্ষন করে। ওদের বন্ধুর দলটা বেশ বড়। মোট সাত জন। যখন রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটে আসে তাদের ছোটখাটো একটা পাখির ঝাকের মতো মনে হয়। বেশ ভালোই দেখায়।

সুভার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সুভা নিজে সবসময় তাদের চা বানিয়ে খাওযায়। এটা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। মানুষ ৭জন হলেও চা বানাতে হয় ৫ কাপ। কারণ বেলী আর রবি চা খায়না। বেশী ভদ্র মানুষরা বোধ হয় চা খায়না। তারা ২জন ফ্রিজ থেকে কোনো একটা ড্রিংকস বের করে খেয়ে নেয়। আজও রোজ দিনের মতো তাই হলো শুধু এর মাঝে আকাশ নেই। তাই আজ চা বানানো হয়েছে চার কাপ। চা খেতে খেতে কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের আড্ডা বেশ জমে উঠল। কথা বলার বিষয়ের অভাব নেই। স্কুল, টিউশন, ইন্টারনেট, এলাকা, এর বাড়িতে কি হলো, ওই মানুষটা কি করল এই নিয়ে হাজারটা কথা। আজ অবশ্য কথার মধ্যে আরো একটা বিষয়

যোগ হয়েছে সেটা হলো নীলের বিষয়। তাকে নিয়ে এক এক জনের এক এক মত। একজন বলে ওই ছেলের ভাব বেশী, ডং করে। আর একজন বলে পড়াশোনায় ভালো হলে তো সাইন্সেই পড়ত, নকল করে করে স্যারের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। টকটুকি তো বলেই ফেলল নীলের নাকি অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাই সে এতো কঠিন প্রশ্নের উত্তর পেরেছে। এমন আলোচনা অনেক্ষণ চলার পর সুভা বলল 'আমার মনে হয় ছেলেটার কোনো সমস্যা আছে। কোনো কারণ ছাড়া কেউ এতোটা ইন্ট্রোভার্ট হয়না'। কয়েকজন সুভার কথার সাথে একমতও হলো। এমন অনেক আলোচনা করতে করতে সন্ধা হয়ে গেল তখন সবার বাড়ি যেতেই হবে। একে একে সবাই উঠে বাড়ি চলে গেল। সুভা আবার সেই একা হয়ে যাবে। বাবার আসতেও বেশ দেরি হয়। এটাই সুভার জীবন। হাজার সুখের মাঝেও সে খুব একা।

•৩ মার্চ ২০১৫

নীলের সাথে সুভার মাঝে মাঝেই কথা হয়। এক সাথে বসাও হয়। কিন্তু নীল রোজ স্কুলে আসেনা। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে সপ্তাতে ৩/৪ দিন আসে। যেই কদিনই আসুক না কেন সে রোজ পড়া ঠিকই পারে। এই কারণে সে এরই মধ্যে কিছু শিক্ষকের পছন্দের হয়ে উঠেছে। এই স্কুলটা অবশ্য বেশী বড় না। এলাকার মাঝে ছোটখাটো একটা স্কুল। এলাকার ছেলে মেয়েরাই এখানে পড়ে। তাই খরচ কম আর শিক্ষকেরাও একটু ভালো ছাত্রছাত্রী পেলে খুশি হয়ে যান। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় ৩/৪ সপ্তাহ কেটে গেল। নীলের সাথে স্কুলের কারোই তেমন বন্ধুত্ব হয়নি তবে সবার সাথেই একটু আধটু কথা হয় তার। পড়াশোনায় ভালো দেখে মোটামুটি সবাই তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী। কেউ এসে কথা বললে সেও অবশ্য চুপ করে বসে থাকে একটা দুটো কথা সেও বলে। এর মাঝে ঘটল এক ঘটনা, একদিন ক্লাসে নীল সবার আগে এসে বসে আছে যেখানে সবসময় নীল সবাব শেষে আসে বা আসেইনা। বিষয়টা দেখে সকলেই বেশ অবাক। নীল আজ প্রথম বেঞ্চে বসেছে আর সুভা তো প্রথম বেঞ্চেই বসে। এসেই সুভা জিজ্ঞেস করল

-কিরে আজ এতো তাড়াতাড়ি এলি যে?

-না এমনিই। আগে আগে ঘুম ভাঙল তাই।

সুভা হঠাৎ খেয়াল করল নীলের হাতে কিছু একটার দাগ। দেখে ঠিক বোঝা গেল না কিসের। সুভা জিজ্ঞেস করল

-তোর হাতে কিসের দাগ ওটা?

-নুডলস্ বানাতে গিয়ে পরে গেছিল হাতে।

-আহারে, ওষুধ লাগিয়েছিস?
-না।
-ওমা এতোটা পুড়েছে আর মলম লাগাসনি। ফোসকা পরবে তো।
-পরবে না, শুধু শুধু চিন্তা করছ।
-আজ বাড়ি গিয়েই মলম লাগাবি।
-হুম
সুভাব এর মধ্যেই কোনো কারণ ছাড়া নীল কে তুই বলতে শুরু করেছে। তবে নীল তুমিতেই আটকে আছে। আজও রোজ দিনের মতো ক্লাস হলো। সেই স্যারদের বকবকানি, পড়াশোনা, মার খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবাই ছোটাছুটি করে বের হতে লাগল। শুধু নীল চুপচাপ বসে আছে।
-কিরে বসে আছিস যে । বাড়ি যাবি না?
-হুম যাব। তুমি আগে যাও।
-চল এক সাথেই বের হই। আজ আবার টুকটুকি আসে নি। একা যেতে ইচ্ছে করছে না।
নীল চুপ করে বসে আছে, একটা কথাও বলছে না। একটু বিরতি নিয়ে সুভা আবার বলল
-আরে চলনা, সবাই বেরিয়ে যাচ্ছেতো।
-আমি আজ বাড়ি যাব না।
-বাড়ি যাবি না মানে তাহলে কোথায় যাবি?
-একটু কাজ আছে।
এই বলে নীল ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে হাটতে লাগল। সুভা জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, জানার দরকারও নেই তাও সুভার মনে একটা ইচ্ছে জাগল সবটা জানার। সুভা নীলের পিছু পিছু যেতে লাগল। সে দেখল নীল স্কুলের পেছনের মাঠটা তে গিয়ে চুপচাপ বসে পরল। এটাই কি নীলের দরকারি কাজ? তা নিয়ে সুভার একটু সন্দেহ থেকেই গেল। সে আর নীলকে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না কারণ সব মানুষের জীবনেই এমন একটা দুটো ঘটনা থাকে যা কাউকে বলা যায় না আর সেটা নিয়ে না ঘাটানোই ভালো। শুধু যে এই ঘটনাটাই প্রথম বা শেষ তা নয়। নীল প্রায়ই এমন অদ্ভুত আচরণ আগে করেছে। যত দিন যেতে থাকে তার অদ্ভুত আচরণ বাড়তে থাকে। কোনোদিন ক্লাসে ঢুকেও বের হয়ে যেত। কোনোদিন তার হাত কাটা থাকত কোনোদিন শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের সাথেই খারাপ ব্যবহার করতো আবার তাদের কাছে ক্ষমাও চাইত। এমন করতে করতেই সময় যেতে লাগল।

•১২ই এপ্রিল ২০১৫

প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষার সময় এসে গেছে। সর্বদাই পরীক্ষার আগে বিগত মাসের বেতনগুলো সম্পূর্ণ পরিষদ করতে হয় এবং পরীক্ষার ফিও দিতে হয়।এবারো তেমন ভাবেই বেতন পরিষদ করে প্রবেশপত্র গ্রহণ করার একটা শেষ তারিখ দেওয়া হলো। সবাই এই কাজটা সঠিক ভাবে করলেও নীল করে নি। শিক্ষকেরাও এই বিষয়ে বেশ হতাশ। সেই বিখ্যাত বিজ্ঞান স্যার টিচার্স রুমে বসে আছে। নীলের বিষয় নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। এক কালে যারা কাউকে অপছন্দ করে আরেক কালে গিয়ে সেই মানুষ গুলোর জন্যই বোধহয় চিন্তা বেশি হয়। তিনি চা খেতে খেতে হঠাৎ দেখল সুভা টিচার্স রুমের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তিনি সুভাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন

-নীলের কি হয়েছে রে? তোর কাছে তো পুরো এলাকার খবর থাকে, কিছু জানিস?

-না স্যার। আমার সাথেও অনেকদিন যোগাযোগ হয় না।

-বুঝতে পারছি না ছেলেটার কি হলো সামনে পরীক্ষা এখনো প্রবেশপত্র দিলে না পরীক্ষা-টরীক্ষা দেবে না নাকি।

-ও অনেকদিন ধরে স্কুলেই আসছে না স্যার। তবে আমার বাসা ওর বাসার পাশেই আপনি বললে আমি গিয়ে দেখতে পারি।

-হ্যাঁ দেখ তো একবার গিয়ে, কিছু জানতে পারলে আমাকে জানাস।

-ঠিক আছে স্যার।

এই বলে সুভা টিচার্স রুম থেকে বের হল। কিন্তু ইকবাল স্যারের কপালের চিন্তার ভাঁজ তাও কমলো না। এত ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে কেন তার এত চিন্তা হচ্ছে উনি সেটা জানেনা। আগেও এমন অনেক হয়েছে কত শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়নি তাদের নিয়ে কখনো এভাবে ভাবেননি তিনি এবার চিন্তা হচ্ছে, অনেক বেশি হচ্ছে।

প্রবেশপত্র গ্রহণের নয় দিন পর পরীক্ষা। সুমি এর মাঝে অনেকবার ভেবেছে নীশের বাড়ি যাবে কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠে নি। দুদিন পর সে স্থির করল আজ তাকে যেতেই হবে। ঠিক যেই ভাবা সেই কাজ। সে নীলের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছে। সাথে টুকটুকিকে নেবে ভেবেও নেয়নি কারণ সুভা সেই প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিল যে কোনো কারণে নীল চায় না তার বাসায় কেউ যাক। সুভাও কখনো যেত না, বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। ওদের বাড়ি একদম পাশাপাশি হওয়ায় যেতে দু তিন মিনিট লাগল। নীলদের বিল্ডিংটা ৫ তলা। তারা কততলায় থাকে সুভা জানেনা । বাসার নিচে দাড়িয়ে সে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল

-নীলরা কত তলায় থাকে বলতে পারবেন?

-কোন নীল?
-এই বাসায় নতুন উঠেছিল কয়েক মাস আগে, চিনতে পেরেছেন?
-ও, রাসেল সাহেবের ভাইগনার কথা বলতেছেন?
-হ্যাঁ
সুভা জানে না নীলের মামার নাম। তাও বলে দিল হ্যাঁ, যদি মিলে যায় তো ভালো নয়তো ফিরে আসবে। -রাসেল সাহেব ৪ তলায় থাকে। ফ্ল্যাট নম্বর ডি থ্রি। কিন্তু আপনি কে?
- আমি নীলের বন্ধু।
কথাটা শুনে দারোয়ান বোধ হয় হয় একটু অবাক হলো। সুভা তাতে পাত্তা না দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। সে নীলদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দারিয়েছে। কলিং বেলটা বাজানোর সাহস হচ্ছে না। কোন একটা অজানা ভয় বা সংকোচ কাজ করছে তার মনে, সেদিকে পাত্তা না দিয়ে সে কলিং বেলটা বাজিয়েই ফেলল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ছোট ছেলে দরজা খুলল।ছেলেটা দেখতে রোগাপাতলা চুলগুলো উস্কো খুশকু বয়স খুব বেশি হবে না তবে দেখেই বোঝা গেল অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির।ছেলেটা একটু বিরক্তির সাথে বলল
- কে আপনি?
-এটা কি নীলদের বাসা?
-নীল আপনার কে?
-আমি নীলের বন্ধু। ওকে একটু ডেকে দেবে?
-কি দরকার নীলকে দিয়ে?
-স্কুলের ব্যাপারে একটু কথা আছে।
সুভার কথা শেষ হতেই ছেলেটা চিৎকার করতে লাগল 'নীল এদিক আয়, তোকে কে জানি খুজছে' কথাটা শুনে সুভা খুব অবাক হল। ছেলেটার বয়স বেশী হলে ৭/৮ হবে। এতটুকু একটা বাচ্চা নীলকে এভাবে ডাকলো বিষয়টা মোটেও স্বাভাবিক নয়। এটাই বোধ হয় নীলের সেই মামাতো ভাই। বাচ্চা ছেলেটা ডাকার প্রায় ৩/৪ মিনিট পর নীল এল। নীলকে দেখে সুভা একটু অবাক হয়ে গেল।তার পুরো শরীর ঘামে ভেজা। দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র কোনো যুদ্ধ করে এসেছে। সুভা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।
-তোর এই অবস্থা কেন?
-তুমি এখানে কি করছ?
-সে সব পরে বলব, আগে বল তোর এই অবস্থা কেন?

এটা বলতে বলতে সে লক্ষ্য করল নীলের হাতে একটা রান্না করার চামচ। সুভা একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল
-তুই রান্না করছিলি?
-হ্যাঁ
-সে তো বেশ ভালো। রান্না কি তোর হবি নাকি?
নীল একটু হেঁসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল।
-আমায় ভেতরে ঢুকতে বলবি না?
-যদি কিছু মনে না করো আমরা ছাদে গিয়ে কথা বলি?
-কেন? ছাদে কেন? মামা-মামির সাথে দেখা করাবি না আমাকে
-না অসুবিধা আছে, তুমি একটু দাড়াও আমি আসছি।
এই বলে নীল ঘরের ভেতরে গিয়ে ৪/৫ মিনিটের মাঝে চলে এলো। সুভা ততক্ষণ বাইরেই অপেক্ষা করছিল। এরই মাঝে নীল এসে উপরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। সুভাও তার পিছু পিছু যেতে লাগল।নীল দের বাসার একতালা পরেই ছাদ। ছাদটা বেশ সুন্দর। অনেক রকম গাছ। দরজা দিয়ে উঠেই হাতের বাম পাশে অনেক সবজির গাছ আর ডানে ফুল গাছ। ফুলের গাছগুলোর মাঝে একটা টেবিল, চারটা চেয়ার। নীল আর সুভা সেখানেই গিয়ে বসল। বিকেল বেলা তেমন একটা রোদ নেই, হালকা মিষ্টি বাতাস। সব মিলিয়ে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। সুভাই কথা শুরু করল।
-তুই কি রান্না করছিলি রে?
-ঐ বিকেলের নাস্তা বানাচ্ছিলাম। তা তুমি আমার বাসায় কেন এসেছো?
-আমাকে ইকবাল স্যার পাঠিয়েছেন।
-কেন। কি দরকারে?
-সামনেই তো পরীক্ষা, প্রবেশপত্র নেওয়ার শেষ দিনও চলে গেছে। তুই কেন স্কুলে আসছিস না সেটা জানতে পাঠিয়েছেন।
-আমি আর স্কুলে যার না।
-যাবি না মানে?
-যাব না মানে যাব না। পরিষ্কার করেই তো বললার।
-তোর মতো এত ভালো ছাত্র স্কুলে যাবে না এটা কেমন কথা।
-কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমি আর পড়াশোনা করব না।
-নীল তুই পাগল হয়ে গেছিস। তুই আমাদের পুুরো আর্টস গ্রুপের গর্ব। তুই পড়াশোল ছেড়ে দিবি এটা সম্ভব না।

-আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। এর থেকে বেশী কিছু বলতে পারব না।
-আমাকে কারণ না বললে আমি কিছুতেই তোর কোনো কথা শুনব না।
নীল মাথা নিচু করে বসে আছে। দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ। নীল কিছু বলছে না, সুভাও কিছু বলছে না। অবশেষে সুভা আবার বলল
-দেখ তোর কোনো সমস্যা হলে তুই আমায় বলতে পারিস। কিন্তু প্লিজ পড়াশোনাটা ছাড়িস না।
নীল কিছুটা সাহসের সাথে সুভার দিকে তাকাল, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় তার মনে আসলেই সাহস নেই। সুভা আবারো বলল
-নীল আমি মন থেকে তোকে বন্ধু মনে করি। তুই আমায় বন্ধু ভাবিস না আমি জানি সেটা। তোর যে কোনো একটা সমস্যা আছে আমি অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। এবার চুপ করে না থেকে আমায় বল সমস্যাটা ঠিক কোথায়।
-বললেই কি তার সমাধান তুমি দিতে পারবে?
-তুই হয়ত জানিস না, আশেপাশের ১০ বাড়িতে কোনো সমস্যা হলে এই সুভাই সবার আগে ছুটে যায়। তোর সমস্যার সমাধান করতে পারব কিনা জানি না তাও একবার চেষ্টা তো করতে পারি।
নীলকে দেখে মনে হচ্ছে সে যে কোনো মুহূর্তে কেঁদে ফেলবে। তার চোখ পানিতে টলটল করছে। নীল কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল
-আমাকে এই সমস্যার থেকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাঁচাতে পারবে না।
-কি হয়েছে সবটা খুলে বল, দেখি কিছু একটা করা যায় নাকি।
নীল বুঝতে পারছে না সে সুভাকে সবটা বলবে কিনা। এসব কথা সে কখনো কাউকে বলে না। তবুও সুভার কথা শুনে তার মনে কোথাও একটা আশার আলো জেগেছে। হয়ত সুভা পারবে তাকে সাহায্য করতে।
-আমার কাহিনি শুনতে তো তোমার অনেকটা সময় লেগে যাবে। কিছুক্ষণের মাঝে সন্ধা হয়ে যাবে।
-আমার সন্ধার আগে বাসায় যেতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আমার অনেক সময়। তুই বল।
নীল আজ তার জীবনের পুরো কাহিনিটা বলবে। যা আগে সে কাউকে বলেনি। নীল সবটা বলতে চেয়েও থেমে গেল। মনে কোথাও একটা দ্বিধা কাজ করছে। সুভা তাকিয়ে আছে নীলের চোখের দিকে। তার চোখ এর মধ্যেই লাল হয়ে গেছে। লাল হওয়ার কারণ সুভা ধরতে পারছে না। রাগ থেকেও হতে পারে বা এতক্ষণ ধরে চোখে পানি ধরে রাখার জন্যও হতে পারে। দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

পাখিরা নিজেদের বাড়ি যেতে শুরু করেছে। নিলের দৃষ্টি টেবিলের ওপর, সুভার দৃষ্টি নীলের দিকে।

রাত আটটা বেজে গেছে। সুভা নীলদের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। রাত আটটা বাজলেও আজ রাস্তা একটু বেশিই নিরিবিলি। কোথাও একটা কুকুরও নেই।কোন কারন ছাড়াই সুভার গা ছম ছম করছে। সে তো কোন ভূতের গল্প শুনে নীলদের বাড়ি থেকে বের হয়নি তাহলে এমন অনুভূতি হওয়ার কারণটা কি? মাথার মধ্যে অনেক কিছু চলছে সুভার। মানুষের জীবনে এত কষ্ট থাকে সেটা আজকে সন্ধ্যাটা না আসলে সুভা বুঝত না। সুভা সারা জীবন ভেবে এসেছে সকলের জীবন বোধহয় তার মতই, সুখ শান্তি দিয়ে ভরা। তবে এত সুখে থাকার পরেও সুভা সব সময় নিজেকে কোন কারণ ছাড়াই অসুখী মনে করত। তার খুব রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ইচ্ছে করছে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলতে 'তুমি আমায় অনেক ভালো রেখেছো বাবা' এসব ভাবতে ভাবতেই সুভা বাড়িতে চলে এলো। সে বাড়িতে এসেই এক কাপ কফি নিয়ে বসেছে। নীলকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই নিয়ে ভেবে চলেছে সাথে নিজের জীবনের ঘটনা গুলোও তাকে খুব ভাবাচ্ছে। নীলের কাহিনিটা শুরু হয়েছিল এভাবে–

তখন নীল অনেক ছোট। বোধ হয় ১ বছরও হয়নি। খুব সুখে ছিল নীলরা। তাদের পরিবারে সে তার বাবা আর তার মা থাকত। পরিবারে অভাব ছিল তবুও সুখের অভাব হয়নি। সেই সময় হঠাৎ করে কালো রাতের মতো তাদের পরিবারে বিপদ নেমে আসে। নীলের মায়ের ক্যান্সার ধরা পরে। ব্লাড ক্যান্সার। নীলের বাবা যেই ছোট চাকরি করে তাই দিয়ে আর চলছিল না। অনেকদিন ধরে একটা ভালো চাকরি খুঁজছিলেম নীলের বাবা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা চাকরির সন্ধান পায় সে। সেখানে গিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্যে তার বাবা বের হয়েছিলেন একদিন বিকেলে। যাওয়ার আগে বলেছিলেন ভালো একটা চাকরির খবর পেয়েছি, সেখানে যাচ্ছি । বিকেল পার হলো, সন্ধা পার হলো, রাত হয়ে গেল, বাবা আর ফিরলেন না। সেদিন রাতে তার মা অনেক খুজেছিলেন তার বাবাকে কিন্তু পাননি। আজও কেউ জানে না কি হয়েছিল সেদিন তার বাবার সাথে। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে প্রায় দের বছর কেটে যায়। এই দের বছর নীল ও তার মাকে নীলের নানা বাড়ির লোকেরাই দেখাশোনা করে। বিশেষ করে তার নানা নানি। দের বছর পর যখন নীলের আড়াই বছর বয়স তখন তার মাও মারা গেলেন। অনেক চিকিৎসার পরও তাকে বাঁচানো যায়নি। সাধ্যের মধ্যে নীলের নানা নানি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তখন নীল

এতটাই ছোট যে সে বুঝতেও পারেনি যে তার মা আর ফিরবে না। নীলের নানাও ধনী ছিলেন না, বৃদ্ধ মানুষ বেশীদিন নীলকে সামলেও রাখতে পারেন নি। এর পর যখন তার চার বছর হয় তখন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার মামার বাসায়। প্রথম এক বছর তাকে বেশ আদর যত্নে রাখা হয়। এর পর আসতে আসতে এমন এক অবস্থা হয় যে নীলের মামি তাকে সহ্য করতে পারেনা। সেই পাঁচ বছর বয়সি ছেলেটা তখন বুঝতে পারে অনাথ হওয়া কাকে বলে। মামি প্রায় তার গায়েও হাত তুলতেন। এলাকার ছোট একটা স্কুলে পরিয়েছে তাকে। ঐ নাম কামানোর পড়া। মামির আচরণ দেখে তার মামাতো ভাইয়েরাও তাকে কাজের লোকের মতো দেখতে লাগে। মামাও মামির সব কথা মেনে নেন। বাড়ির প্রায় সব কাজই নীল করে। এমনকি মামাতো ভাইদের জুতোটাও তাকে পরিষ্কার করে দিতে হয়। ক্লাস এইট পর্যন্ত অনেক কষ্টে পড়েছে নীল তবে বর্তমানে অত্যাচারের মাত্রা এতো বেড়েছে যে পড়াশোনা চালানোটা আর সম্ভব হচ্ছে না। নীলের জমানো কিছু টাকা ছিল সেই দিয়েই নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। সাইন্স গ্রুপে খরচ এবং ভর্তির টাকা একটু বেশী হওয়ায় পর্যাপ্ত রেজাল্ট থাকার পরও সে ভর্তি হতে পারে নি। ভর্তির পর থেকে একটা মাসের বেতনও সে দিতে পারে নি। এখন তার কাছে আর এক টাকাও নেই। বেতন পরিশোধ না করলে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব না। আর তা ছাড়া এতো যুদ্ধ করে আর যাই হোক লেখাপড়া হয় না।

পুরো ঘটনাটা নীলের গুছিয়ে বলতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেছিল তাই এতটা দেরি হলো সুভার বাড়িতে ফিরতে । কথা শেষ করে নীল সুভাকে বলেছিল
-আছে তোমার কাছে এই সমস্যার সমাধান? পারবে আমার বাবা মাকে ফিরিয়ে দিতে? আমার পড়াশোন চালানোর সুযোগ করে দিতে? আমার জীবনটা আর দশটা লোকের মতো করে দিতে?
-পারতেও পারি, বলা তো যায় না কবে কিভাবে কাকে সাহায্যে লেগে যায়।
-কখনো পারবে না, কোনোদিন না।
কথা শেষ হতেই নীল প্রচুর কেঁদেছিল। হঠাৎ সুভা এসব ভাবতে ভাবতে লাফিয়ে উঠলো। তার হাত থেকে কিছুটা কফি তার পায়ে পরল। সেদিকে তার খেয়ালও নেই। মুহূর্তের জন্য সুভার মনে হল এইমাত্র নীল তার কানের সামনে কেঁদে উঠলো। সুভার খুব মায়া হচ্ছে নীলের জন্য।

•২৫ এপ্রিল ২০১৫

পরীক্ষা শুরু হবে সকাল নয়টা থেকে। সুভা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে আটটার সময় নীলের বাসায় গেল। সে এর মাঝেই নীলের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তার আজ খুব খুশির দিন তার কারণ দুটো, প্রথমটি হলো সে নীলকে সাহায্য করতে পেরেছে আর অন্যটি হলো আজ নীল তাকে সাহায্য করবে। তাদের দুজনের সিট অদ্ভুতভাবে একদম পাশাপাশি পরেছে। নীল হলো প্রথম সারির তিন নম্বর সিটে আর সুভা তৃতীয় সারির তিন নম্বর সিট। নীল খুব সুন্দরভাবে সুভাকে পরীক্ষায় সাহায্য করতে পারবে এই ভেবেই সুভা খুশিতে আত্মহারা। ঠিক আটটা পাঁচএ সুভা নীলদের বাড়িতে গেল। দরজায় টোকা দিতেই নীল দরজা খুলল। কিন্তু সে এখনো তৈরি হয়নি। সুভা চিৎকার করে বলল

-কিরে এখনো তৈরি হোস নি কেন?তোকে না সেদিন বলে গেলাম পরীক্ষার দিন তোকে নিতে আসবো।

-আমি তো নিশ্চিত ছিলাম না পরীক্ষা দিতে পারব কিনা।

-আমি যখন একবার বলেছি তুই পরীক্ষা দিবি তখন দিবিই। এখন এত কথা না বলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েনে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সুভা নীলের দিকে তার প্রবেশপত্রটা বাড়িয়ে দিল। নীল প্রকাশ না করলেও তার ভেতরের খুশিটা ঠিকই বোঝা যাচ্ছে।

-এবারতো তৈরি হয়ে আয়।

-হ্যাঁ এখনই আসছি।

-আমি নিচে দাড়াচ্ছি তুই আয়।

-ঠিক আছে।

সুভা নিচে গিয়ে অপেক্ষা করতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে নীল চলে এলো। সে সাদা একটা শার্ট পরেছে যেটা দেখেই বোঝা যায় স্কুলের শার্ট নয়। আর কালো একটা প্যান্ট, এটাও বোধ হয় স্কুলের নয়। কিন্তু হঠাৎ করে তাকালে বোঝা যায় না খুব লক্ষ্য করলে তবেই বোঝা যায়। তার হাতে একটা কলম আর একটা পেন্সিল। নীলের হাতে কোন একটা জাদু আছে। এই কারণে তার স্কেলের প্রয়োজন হয় না হাত দিয়ে স্কেল করে নেয়। তাই পরীক্ষার জন্য তার এই কলম আর পেন্সিল সাথে তার মাথা কতটুকুই যথেষ্ট। নীল নেমে আসতেই সুভা বলল

-আচ্ছা শোন, আমি এখন আগে রেস্টুরেন্টে যাব খেতে। আমি সকালে খেয়ে আসিনি।

-ও আচ্ছা।

- তুইও যাবি আমার সাথে।

-আবার আমি কেন যাব।
-আমি বলেছি তাই। চল এবার।
নীল আর কথা বাড়ালো না। যেই মানুষটা তাকে এতো সাহায্য করেছে তার জন্য এতটুকু করাই যায়। তাদের স্কুলের পাশেই একটা ভালো রেস্টুরেন্ট। বেশ বড়। তারা
দুজন যখন সেখানে ঢুকলো তখন বাজে আটটা ত্রিশ। রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই দু চারজন সুভাকে জিজ্ঞেস করল 'ভালো আছেন?' বোঝাই যায় তার খুব পরিচিত এখানের সবাই। সে ঢুকতে ঢুকতেই কেউ একজনকে বলল 'আমায় দুটো চিকেন চিজ বার্গার আর দুটো অরেঞ্চ জুস দেবেন'। সুভার কথা শেষ হতেই নীল বলল
-দুটো করে কেন দিতে বললে?
-আমার একটা দিয়ে পেট ভরে না তাই।
নীল আর কথা বাড়ালো না। তারা দুজনে গিয়ে একটা তিন চেয়ারের টেবিলে বসল। একটা চেয়ার ফাঁকাই পরে আছে।
-তুমি এতো সব কিভাবে করলে?
-কতো সব।
-এই যে, আমার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা।
-আরে তেমন কিছুই করিনি। বাবাকে গিয়ে বললাম যে আমার এক বন্ধুর বাবা মা নেই। টাকা পয়সার একটু সমস্যা ওকে ফ্রিতে পড়ার ব্যবস্থা করে দাও। পরে তোর নাম, রোল জেনে নিয়ে ব্যবস্থা করে দিল।
-এতো সহজে হয়ে গেল সবটা?
-এতো সহজে বোধ হয় হয়নি। তবে কি করে সব হয়েছে সেটাও বাবা আমায় বলেনি শুধু এতোটুকু বলেছে যে, প্রিন্সিপল বলেছেন তুই এস.এস. সি পর্যন্ত ফ্রিতে পড়তে পারবি কিন্তু তার জন্য একটা শর্ত দিয়েছেন।
-কী শর্ত?
-তোকে সবসময় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। আর আমি তো জানি তুই পারবি।
-আচ্ছা কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি? তুমি তো কতো ভালো ফ্যামিলির মেয়ে, তুমি এই স্কুলে কেন পড়ো?
-ঐ যে বাবার পরিচিত। তাই এখানেই পড়ি। আর তা ছাড়া বড় স্কুলে পড়ে কি হবে, এসব নিয়ে আমার এতো মাথা ব্যাথা নেই।
-তোমার বাবা তোমার সব কথা শোনেন তাইনা?

-হ্যাঁ তা শোনে। কিন্তু কথা শোনার জন্য যেই সময়টা দরকার সেটাই বাবার থাকে না।

কথাটা বলতে গিয়ে সুভার কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। এরই মাঝে তাদের খাবার এসে গেছে। সুভা নিজের খাবারটা নিয়ে বাকি খাবারটা নীলের দিকে এগিয়ে দিল। সাথে সাথে নীল প্রায় চিৎকার করে উঠল

-আরে না না আমি এসব খাব না।

-তোকে তো আমি এমনিতে খাওয়াচ্ছিনা।

-তাহলে কেন খাওয়াচ্ছো ?

-আমার লাভের জন্য খাওয়াচ্ছি।

-কিসের লাভ?

-আজ আমায় পরীক্ষায় তুই হেল্প করবি।

-সে আমি এমনিতেই করব। তুমি এর মাঝেই আমার অনেক সাহায্য করে ফেলেছ। খাবারগুলো ফেরত দিয়ে দাও। নয়তো তুমি খাও, তোমার তো দুটো করে লাগে।

-তুই খুব বাজে বকিস, চুপচাপ খা তো।

নীল চুপ করে বসে রইল। সুভা আবার বলল

-এবার না খেলে তোর মাথায় ঢেলে দেব জুসটা। যত দেরি করবি পরীক্ষার হলে যেতে কত দেরি হবে।

-খাচ্ছি খাচ্ছি।

নীল প্রথমে একটু লজ্জা বোধ করলেও কিছুক্ষণের ভেতর সেটা কেঁটে গেল। দুজনে খেতে খেতে আরো অনেক গল্প করল। পরীক্ষা শুরু হতে আর ১০ মিনিট। সুভা খাবার বিল দিয়ে নীলকে নিয়ে স্কুলে ঢুকে গেল। সিট আগের দিনই সুভা এসে দেখে গিয়েছিল তাই আর সিট খোঁজার ঝামেলা থাকল না। দুজনেই যে যার জায়গায় বসে পরল। প্রথম পরীক্ষা বাংলা, বেশ সহজ তাও সুভা নীলের থেকে কয়েকটন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নেয়। তিন ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়ে সকলেই বেশ ক্লান্ত। পরীক্ষা শেষে নীল ক্লাসরুম থেকে বের হলো সবার শেষে তার দেখাদেখি সুভাও তাই করল। ক্লাসরুম থেকে বের হয়েই নীল সুভাকে বলল

-থেংকস

-কেন?

-আজ তুমি না থাকলে কিছুই হতো না।

- বন্ধু বন্ধুর জন্য এতটুকু করতেই পারে। থেংকস এর কি আছে।

-আমি কোনোদিন তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।

-হ্যাঁ হয়েছে, এবার বাড়ি চল।
বাড়ি যেতে যেতেও তারা অনেক গল্প করল। আজকাল কেন জানি সুভার অন্য বন্ধুরা তার সাথে বেশী একটা কথা বলে না। কারনটা অবশ্য অজানা। রাস্তায় হঠাৎ টুকটুকির সাথে দেখা।
-বাহ নীল পরীক্ষা দিয়েছে ওতো তাহলে ফার্স্ট হবেই।
-হ্যাঁ আমারো তাই মনে হয়। আজকাল তো তোকে দেখাই যায়না।
-এই যে দেখছিস।
-সে তোবঅনেকদিন বাদে। আজ বিকেলে বাসায় আসিস।
-ঠিক আছে আসব।
নীল এর মাঝে কোনো কথা বলল না। দুজনেই তাদের বাড়ির কাছে চলে এল। বাড়ির দরজার ভেতরে ঢুকতেই নীলের মনে হলো সুভার কাছে গিয়ে তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে। নীল জানেনা এই কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করবে সে। নীল কেবল ঘুরে যাবে সুভার কাছে অমনি তার মনে পড়ল দুপুরের রান্নাটা তাকেই করতে হবে। আজকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে মামীকে বলে এসেছিল দুপুরের রান্নাটা সে পরীক্ষা দিয়ে এসেই করবে। এখন সুভার কাছে কি সময় নষ্ট করা যাবে না। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে ছোট একটা হোচট খেলো নীল ।

•২৭ মে ২০২৪
পরীক্ষা শেষে বেশ বড় একটা ছুটি। এক একজন এক একটা জিনিস ভাবছে ছুটিতে করার জন্য। তবে সুভার ভবনা ভিন্ন। সে এই ভাবনায় সকলকে নিতে চায়। তার সব বন্ধুদের। সব সময়ের মতো আজও সুভা সবাইকে ফোন করে তার বাসায় আসতে বলেছে। পরীক্ষা শেষ সবারই হাতে বেশ সময়। বিকেলে নীলকেও আসতে বলে রেখেছিল সে। সবাই সময় মতো এসে গেছে। তবে নীল এখনো আসে নি। প্রায় ৩০ মিনিট বাদে সেও চলে এলো। সুভা যদিও আশা করেনি নীল আসবে। নীলকে দেখে সবাই বেশ খুশি হলো। সবাই একসাথে বসেছে ছুটি কাটানোর জন্য একটা ভালো চিন্তা ভাবনা করতে। তবে সুভা সবাইকে ডেকেছে শুধু তার ভাবনাটাই জানাতে। সে মনে মনে মোটামুটি নিশ্চিত সে এটাই করবে। এখন শুধু সবার মত পাওয়ার অপেক্ষা। এদিকে নীল সুভার বাড়িতে এসে একটু অস্বতিবোধ করতে লাগল। বেশ বড়লোক বাড়ি, এমন কিছু নেই যেটা এই বাড়িতে পাওয়া যাবে না। শুধু মানুষ ছাড়া সবই আছে এখানে। সবাই আসার আগে থেকেই কিছু চিপস্ আর বিস্কুট এনে বসার

ঘরে রাখা হয়েছে। সবাই এসে বসার সাথে সাথে সুভা খুব গাম্ভীর ভাবে বলতে লাগল

-তোদের সবাইকে খুব দরকারি কথা বলতে ডেকেছি।

সবাই ভাবতে লাগল কি না কি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে সভা। টুকটুকি অবাক হয়ে বলল

-কি কথা রে? খুব ভয়ংকর কিছু?

-বাজে বকিস না, সবাই মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমাদের পরীক্ষা শেষ। আমি এভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করতে চাইনা। তাই এই ছুটিটা কাজে লাগানোর জন্য আমি একটা প্ল্যান করেছি।

রোহান বলল

-প্ল্যানটা তো বল?

-আমি ভেবেছি আমরা সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে যাব।

অমনি আকাশ বলল

-না না আমি একা কোথাও যাব না।

-আরে পুরোটা শেষ করতে দে। শোন আমরা মোট ৮ জন আছি সাথে বাবা আর তার সাথে জামাল আঙ্কেল যাবে। মোট ১০ জন।

রোহানকে দেখে মনে হলো সে এরই মাঝে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে । খুব অগ্রহের সাথে বলল -কোথায় যাবি ভেবেছিস? চল কক্স বাজার যাই। খুব মজা হবে।

-না না ওটা বেশ দুরে হয়ে যায়। আমরা এতটুকু ছেলে-মেয়ে কারো বাড়ি থেকেই এতদূর ছাড়বে না। আমি ভাবছি সোনাপুর যাব। তোরা হয়ত জায়গাটার নাম শুনিস নি। তবে এই জায়গায় আমি অনেক ছোট বেলায় গেছিলাম। এতো সুন্দর তোরা বিশ্বাসও করতে পারবি না। আর ওখানে বাবার বিজনেসের একটা বড় অংশের কাজ হয়। তা ছাড়া সব থেকে বড় সুবিধা ওখানে বাবার নিজস্ব রিসোর্ট আছে। থাকা খাওয়া কোনো কিছুর সমস্যা হবে না। এখন তোরা যদি রাজি থাকিস আমি বাবাকে বাজি করিয়ে নেব।

রোহান লাফিয়ে উঠে বলল

-আমি রাজি।

সাথে টুকটুকিও তাল মেলালো। সুভা বাকি সবার দিক তাকিয়ে বলল

-তোরা কিছু বল।

বেলী একটু মুখ বাকা করে বলল

-আমি ভেবেছিলাম এই ছুটিতে পরের পরীক্ষার পড়াটা এগিয়ে রাখব।
-একদম চুপ কর। পড়ে কিছুই হবে না। তোরা যাচ্ছিস। এর মধ্যে আকাশ বলল
-ধুর কে থাকবে না থাকবে। মাকে ছাড়া যেতে ইচ্ছে করছে না। আর মা আমায় যেতেও দেবে না।
-ওসব নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। তুই শুধু একবার বল যাবি বাকিটা আমি দেখে নেব।
-সবাই যখন বলছে তখন তুই যদি মা কে ম্যানেজ করতে পারিস তাহলে যাব।
আর ফাহাদ নিরপেক্ষ। সবাই রাজি তো সেও রাজি। সুভা এবার নীলকে বলল
-কিরে তুই যেতে পারবি তো?
নীল এতক্ষণ নিজেকে এসব আলোচনার বাইরে মনে করেছিল। সুভার কথাতে তার হুশ ফিরল
-নারে আমি কি করে যাব। ওসব হবে না আমার দ্বারা। তোরাই যা। আমি যাব না।
-যাবি না মানে আমরা সবাই যাব আর তুই যাবি না।
-আমার যেতে ইচ্ছা করছে না সুভা জোর করিস না প্লিজ।
-তোর মামিকে রাজি করানোর দ্বায়িত্ব আমার। তোকে উনি জোর করে পাঠাবে। খুশি মনে।
-অযথা অসম্ভব কথা বলছিস কেন।
-দেখইনা আমি কি করি।
-সুভা আমি কোনো ঝামেল চাইনা তোরাই যা।
সবাই নীলের এই কথায় না বলে দিল। সকলেরই এক দাবি নীলকে যেতেই হবে। খুব কম সময়েই সবাই নীলকে আপন করে নিয়েছে। আজ অবস্য মনের অজান্তে নীলও সবাইকে আপন করে নিয়েছে কারণ সে এরই মধ্যে সবাইকে তুই বলতে শুরু করেছে। সুভা আবার বলল
-কোনো ঝামেলা হবে না। তুই সবটা আমার উপর ছাড়।
-দেখ তোরা শুধু শুধু জেদ করছিস। আমি যাব না মানে যাব না এটা নিয়ে আর বারাস না। আজ আমি উঠি, কাজ আছে।
এই বলে নীল কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে গেল। সুভা নীলকে পেছন থেকে ডাকতে গিয়েও ডাকলো না।

দুই নম্বর রোডের ৩৫ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুভা। আজ সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় দারোয়ান কোন প্রশ্ন করল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করলো সুভা অবশেষে কলিং বেলে খুব আস্তে করে চাপ দিল, কেন এত আস্তে চাপ দিল সুভা জানে না। কলিং বেল চাপতেই সেই ছোট ছেলেটা দরজা খুলল। ওকে বোধ হয় এই বাসার দরজা খোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । দরজা খুলতেই সুভা কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে নীলকে ডাকতে লাগল। নীল সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে আসল। নিল খুবই অবাক সাথে ভীত। নীল কোন কথা বলার আগেই সুভা বলল তোর মামিকে ডাক।

-প্লিজ কোনো ঝামেলা করিস না। তুই হঠাৎ এভাবে এখানে ?

-আগে ডাক।

-আগে কি হয়েছে সেটা আমায় বল।

এরই মাঝে বাচ্চা ছেলেটা তার মাকে ডাকতে শুরু করলো। ডাকার দু মিনিটের মধ্যে মামি চলে এলো। নীলের মামী দেখতে খুবই সাধারণ। পরনে শাড়ি , চুল খোপা করা ওতোটা মোটা না, তবে চেহারা দেখলে বোঝা যায় রাগ আছে বৈকি। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুভা খেয়াল করলো ভদ্রমহিলা ভ্রু কুঁচকে খুবই বিরক্তির সাথে বের হলো যার ফলে সহজেই তার মেজাজটা আন্দাজ করা যায়। সুভা কে দেখার সাথে সাথে মামীর ভ্রু কোঁচকানোর মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। মামি বোধ হয় সুভার ছেলেদের মতো পেষাক দেখে একটু বেশিই বিরুক্ত হলো। সুভা বলল

-আন্টি আপনার সাথে খুব দরকারি কথা ছিল।

-আমার সাথে? আমার সাথে তোমার কি কথা, তাছাড়া তুমি কে? চিনতেই তো পারলাম না।

-একটু বসে কথা বলি? আর আমি সুভ। নীলের বন্ধু। আমরা একসাথেই পড়ি।

মামি খুব বিরক্ত হলেও তাকে বাধ্য হয়ে সুভাকে বসতে দিতে হলো। সুভা আবার শুরু করল

-আমি আসলে আপনার লাভের জন্যেই এসেছি।

-আমার আবার কিসের লাভ। তোমার মত একটা বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে আমার আবার কি লাভ হবে।

-আসলে আন্টি, আমার বাবা সোনাপুর নামের একটা জায়গায় ব্যবসা করে তো ওখানে একটা ক্যাম্পেইন হচ্ছে।

-সেটা আবার কি?

-মানে ওখানে গিয়ে কিছু জায়গায় ঘুরে সেটার উপরে একটা আর্টিকেল লিখতে হবে।

-তাতে আমার কি লাভ।

-এই পুরো কাজটা করতে হবে ছাত্র ছাত্রীদের। তো এই কাজে যারা যারা যুক্ত থাকবে তাদের সবাইকে পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে। আমার সব বন্ধুরা যাচ্ছে সেখানে তাই আমি ভাবলাম নীল গেলে টাকাটা পেত। আপনার হয়ত তাতে লাভ হতো।

টাকার কথা শুনেই মামির চোখ কেমন জানি উজ্জল হয়ে উঠল। সে বললেন

-পাঁচ হাজার টাকা?এতটুকু কাজে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে?

-জ্বি

-হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যাও মা ওকে। আমার কোনো আপত্তি নেই।

মামির লোভের পরিমাণটা তার কথা শুনেই বোঝা গেল। শুধু টাকার কথা শুনে কোনো কিছু বাঝ বিচার না করেই নীলকে যেতে বলে দিল। সুভার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে সে ঠিক জায়গায় চিলটা মেরেছে। -নীলকে এখন একটু নিয়ে যাই? সবটা তো বুঝিয়ে দিতে হবে।

-হ্যাঁ নিয়ে যাও। এই নীল যা ওর সাথে। আচ্ছা মা তোমার নামটা কি জানি বলেছিলে?

-সুভা।

এই বলে সুভা নীলকে নিয়ে বের হয়ে গেল। নীল এখনো বুঝতে পারছেনা এটা স্বপ্ন না সত্যি। মুহূর্তের মধ্যেই কত কিছু হয়ে গেল। সুভা মেয়েটা এত অদ্ভুত কি করে। কত সহজেই সবকিছু সামলে নেয়। নীলের হঠাৎ মনে হল পৃথিবীতে কোথায় এমন কিছু নেই যার সমাধান সুভা করতে পারবে না। তারা দুজন বাসার নিচে নেমে ক্লাব মাঠে যাওয়ার জন্য হাটছে।

-তুই আসলেই যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারিস।

-হ্যাঁ তাতো আগেই বলেছিলাম।

-আমি অবাক হয়ে গেছিলাম কি করে সামাল দিলি সবটা। কিন্তু তুই এটা ঠিক করিস নি সুভা। আমি তোকে বলেছিলাম আমি যাব না। আমাকে না জানিয়ে এভাবে আমার বাড়িতে এসে এত ঘটনা ঘটানো একদমই উচিত হয়নি তোর।

সুভা নীলের কথা শুনে হাঁসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল

- হয়েছে হয়েছে। এখন দোষ দাওয়া বন্ধ কর। তুই বলেছিলি তুই কোন ঝামেলা চাস না। কোন ঝামেলা তো আমি বাধাইনি তাই না। সব তো ঠিক ঠাক এবার যাচ্ছিস তো তুই? যদিও না যেয়ে কোন উপায় নেই, তুই না যেতে চাইলেও মামী জোর করে তোকে পাঠাবে।

এই বলে সুভা আরেক দফা হেসে নিল

-হ্যাঁ যাব। তবে এসব আইডিয়া তোর মাথায় এলো কেমন করে?
-তোর মামির সামনে যা বলেছি তার অর্ধেক আমিও না বুঝেই বলেছি। ক্যাম্পেইনের সাথে আর্টিকেলের কি সম্পর্ক, কেমন সম্পর্ক তার কিছুই আমি জানি না।
-যদি মামী বুঝে যেত। আমাকে তো আস্ত রাখতই না সাথে তোকেও।
-কিছু মানুষ টাকার কথা শুনলে আর কিছু নিয়েই ভাবে না। তোর মামীর ব্যাপারে শুনে আর তাকে দেখে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম, তাই এসব করা।
-কিন্তু এর মাঝে বড় একটা ঝামেলা আছে।
-টাকার ব্যাপারটা তো, সে আমি দেখে নেব। আমার কাছে জমানো অনেক টাকা আছে। বাবা প্রায় আমাকে টাকা দেয়। ওসব টাকা ওভাবেই পরে থাকে। সেখান থেকে দিয়ে দেব।
হঠাৎ করে নীলের মনটা কেমন জানি খারাপ হয়ে গেল। সুভা একটু হেঁসে বলল
-শোন টাকাটা কিন্তু তোকে দিচ্ছি না। তোর মামিকে দিচ্ছি তাছাড়া আমি তোকেও হেল্প করছি না, সবাই তোকে নিয়ে যেতে চায় শুধু সব বন্ধুদের ইচ্ছে পূরণ করছি।
নীল কেন জানি আর কোন কথা বলতে পারলো না।
-শোন আমরা আগামী মাসের ৩ তারিখ যাচ্ছি। সকাল সাতটায় বের হবো। পুরো একটা বাস ভাড়া করা হবে। আর ৬ তারিখ ফিরে আসব। ওখানে সবটা বাবাই ম্যানেজ করে নেবে। রাজি করিয়েছি। বাবারো নাকি সোনাপুর কাজ আছে তাই আর না করল না।
-ঠিক আছে।
-সব গোছগাছ করে রাখিস, আমি বাকি সবাইকে জানিয়ে দেব।
-হুম।
এরই মাঝে তারা ক্লাব মাঠ ঘুরে বাড়ির দিক রওনাও দিয়েছে। যেতে যেতে সুভা নীলের হাতে তিনটে কচকচে এক হাজার টাকার নোট গুজে দিল।
-এটা দিয়ে আমি কি করব?
-টাকাটা তোর মামিকে দিবি। বলবি এটা এ্যাডভান্স দিয়েছে ক্যাম্পেন কোম্পানী থেকে তাহলে আন্টির তোকে পাঠানোর ইচ্ছে আরো বাড়বে।
সুভার কান্ড কারখানা দেখে নীলও এবার হাসতে লাগল। যেখানে অন্য সময় হলে নীল হয়তো রেগে যেত বা খুবই লজ্জাবোধ করত কিন্তু আজকাল সুভা সামনে ওসব কোন কিছুই তার বোধ হয় না।

•৩ জুন ২০১৫

দেখতে দেখতে তাদের যাওয়ার দিন এসে গেল। আগে থেকেই কথা বলে রেখেছে সুভা সবার সাথে। যে যার মতো সব গুছিয়ে রেখেছে। যার যা যা প্রয়োজন সবাই সব নিয়েছে। কেউ কেউ অপ্রযোজনীয় জিনিসও নিয়েছে।স্বাভাবিক ভাবেই এতোটুকু বয়সে দূরে ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে তাও জীবনে প্রথমবার পরিবারকে ছাড়া বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া। সবারই উত্তেজনার মাত্রা অনেক বেশি। সুভার বাবা একটা বাস ঠিক করেছে সেটাতেই সবাই যাবে। রিসোর্টের কেয়ারটেকার কেও বলা হয়েছে সে রান্না-বান্না সব করে রাখবে। তাদের যাবার কথা সাতটায়। ছটার দিকেই সবাই সুভার বাসার নিচে এসে হাজির। তারা সবাই সকালের খাবারের জন্য কিছু না কিছু খাবার বানিয়ে এনেছে। যেতে যেতে সে সবই খাবে তারা। প্রায় ছটা ত্রিশের মধ্যে সকলেই তৈরি যাত্রা শুরু করার জন্য। জামাল আঙ্কেলই সব কিছু দেখাশোনা করছে । শুধু সুভার বাবা অর্থাৎ আলাউদ্দিন সাহেবেরই আসতে দেরি হলো। সেও সাতটার আগে এসে গেল। সাতটার কিছুক্ষণ আগেই বাস ছাড়া হলো। নীল এর আগে আলাউদ্দিন সাহেব কে দেখেনি। সেও নীলকে দেখেননি। আলাউদ্দিন সাহেব বেশ লম্বা-চওড়া, চোখে কালো চশমা, সুট কোর্ট পরা, মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ। হঠাৎ করে দেখলে একটু ভয় লাগে। দানবীয় আকৃতি যাকে বলে। বাস ছাড়ার পর সে নীলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল।

-তুমিই বুঝি নীল?

-জি।

-সুভা তোমার কথা অনেক বলেছে।

নীল ভদ্রতা দেখানোর জন্য একটু হাসল। আলাউদ্দিন সাহেব সবার সাথেই একটু আধটু কথন বললেন। সকলকে সুন্দর মতো বসতে বলেই সে চলে গেলেন। সকলেই বেশ সুন্দর মতোই বসেছে। ড্রাইভারের সিটে ড্রাইভার। তার ঠিক পেছনের সিটে জামাল আঙ্কেল আর আলাউদ্দিন সাহেব। তার পেছনের সারিতে একপাশে বসেছে সুভা আর টুকটুকি অন্য পাশে নীল আর ফাহাদ। তারপরের সারিতে একপাশে আকাশ আর রোহান অপর পাশে বেলী আর ররি। তার পছনের সব সিট গুলোই ফাঁকা সেখানে সকলের জামা-কাপরের ব্যাগগুলো রাখা হয়েছে। বাসটা দেখতে বেশ গোছানো লাগছে। সোনাপুর যেতে তিন-চার ঘন্টা লাগছে। সোনাপুর যাওয়ার আগে বাস কোথাও থামবে না। বাসেই খাওয়া দাওয়া করবে সবাই। যত তাড়াতাড়ি যেতে পরবে ততই ঘোরার সময় বেশি পাওয়া যাবে। সকলে যে যার খাবার বের করে খেতে শুরু করল। একজনের খাবার আর একজন খাওয়া এ যেন

বন্ধুত্বের একটা চিহ্ন। সবাই যেহেতু কিছু না কিছু এনেছে, যে কোন রান্না পারে না সেও কিছু একটা কিনে এনেছে। সবথেকে ভালো খাবার এনেছে বেলী সে রান্নায় বেশ ভালো। সে এনেছে গরম গরম চিকেন চাপ আর পরোটা। এর পরের ভালো খাবার এনেছে নীল সে ছেলে হলেও রান্নায় একদম পাঁকা। নীল এনেছে অনেক রকম সবজি দিয়ে নুডলস্। তার স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতো। এ ছাড়া কেউ তেমন ভালো কিছু আনে নি। সুভা এনেছে ফ্লাক্স ভর্তি চা। ফাহাদ এনেছে চকোলেট। রবি এনেছে কোল্ড ড্রিংকস। রোহান একটা হেলথ ড্রিংকস এনেছে যেটা সে ছাড়া আর কেউই মুখে দিতে পারেনি। আকাশ এনেছে সবথেকে অদ্ভুত জিনিস, ছোট একটা বোতল ভর্তি হাজমোলা। সেটা সবাইকে খাওয়ানোর জন্যই সে পাগল হয়ে আছে। তার ধারণা সে সব থেকে ভালো খাবার এনেছে কারণ এটা খেলে সবার ভারী ভারী খাবার হজম হবে। অর্থাৎ এটা সবথেকে স্বাস্থ্যকর। খাবারগুলো সকলেই বেশ ভালোভাবে খেল তবে জামাল আঙ্কেল আর সুভার বাবা কিছুই খেলেন না। তারা হয়ত আগে থেকেই খেয়ে এসেছিলেন। তাদের যাত্রার প্রায় দুঘন্টা হয়ে গেছে। এখন সময় নয়টা। আস্তে আস্তে শহরের পরিবেশ পাল্টে বাসটা গ্রামের পরিবেশে ঢুকতে শুরু করেছে। চারিদিকে সবুজ, অনেক দূরে দূরে বাড়ি ঘর, কিছু
বাড়ির সামনে পুকুরও আছে। ওখানে অনেক মানুষ নিজেদের কাজ করছে পুকুরের পানি দিয়ে। অনেক বাচ্চারা বাড়ির সামনে খেলছে। সবকিছুই কম বেশি দেখা যাচ্ছে বাস থেকে। এরই মাঝে সূর্য উঠে গেছে সূর্যের আলোটা হালকা বাকা হয়ে বাসের উপর পরছে।এই ধরনের আলো খুবই বিরক্তিকর সোজা চোখের এসে লাগে। এই সময়ে সুভার বাবা বাস থামিয়ে সকলের জন্য বেশ কিছু চিপস্, ডাল ভাজার প্যাকেট নিয়ে এলো। লোকটাকে দেখে যতটা ভয়ংকর মনে হয় ততটা বোধ হয় তিনি নন। রোহান সাথে করে একটা ক্যামেরা এনেছে। সে এই ফাঁকে কিছু ছবি তুলে নিল। খাওয়া দাওয়া করতে করতে গ্রামীন পরিবেশ দেখার মজাই আলাদ। তারা ১০:৪৫ এ ঠিক রিসোর্টের সামনে পৌঁছালো। সুভা আসলেই ঠিক বলেছিল এ এক অপূর্ব জায়গা। দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়। চারদিকে গাছ, রিসোর্টের মাঝে একটা সুইমিই পুলও আছে। অনেক বড় জায়গার উপর এইসব করা হয়েছে। তারা সকলেই বুঝতে পারছে আসলেই এবার তাদের ছুটিটা খুব ভালো ভাবে কাটবে। হাতে সময় তিনদিন এর মাঝেই সব জায়গায় ঘুরতে হবে। সোনাপুর মূলত পর্যটকদের ঘুরতে আসার একটি প্রিয় জায়গা। আশপাশে ঘুরে দেখার মতো অনেক জায়গা। সকলেই খুব উত্তেজনায় আছে। কম বয়সে নতুন কোন কিছু নতুন ঘুরে দেখার মজাই আলাদা। এর মাঝে জামাল-আঙ্কেল বললেন,

-তোমরা এবার ঠিক করো কে কোন ঘরে থাকবে।
সুভা বলল
-আমরা মেয়ে তিনজন এক রুমেই থাকব।
তার কথার সাথে বেলী আর টুকটুকিও হ্যাঁ মেলালো। জামাল আঙ্কেল আবার জিজ্ঞেস করলেন
-আর ছেলেরা?
এবার রোহান বলল
-আমরা তো মোট পাঁচ জন।এত মানুষ এক ঘরে থাকা যাবে না। এক ঘরে তিনজন আর এক ঘরে দুজন থাকলেই হলো।
-কে কার সাথে থাককে এবার সেটা ভেবে নাও।
কোন ঘরে কার থাকা হবে এই নিয়ে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হলো রবি, আর আকাশ এক ঘরে থাকবে কারণ তারা দুজনেই শান্ত স্বভাবের আর রোহান, ফাহাদ, নীল এক ঘরে। জামাল অঙ্কেল বললেন
-ঠিক আছে আমি তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এখানে প্রায় ৮টা ঘর আছে। আমি সবগুলোই খুলে দিচ্ছি। কে কোনটায় থাকবে দেখে নাও।
-আচ্ছা আঙ্কেল বাবা কোথায়? বাবাকে তো দেখছি না।
-উনি কাজে গেছেন। তোমার বাবা কত ব্যস্ত মানুষ জানোই তো মা। বাস থেকে নামতে না নামতেই চলে গেলেন কাজে।
এসব কথা বলতে বলতেই তাদের ঘর খুলে দেওয়া হলো। সব থেকে ভালো তিনটে ঘর তারা বেছে নিল। জামাল আঙ্কেল যাওয়ার সময় বললেন
-এবার যে যার ঘরে গিয়ে সব গুছিয়ে বিশ্রাম নাও। ঠিক ১টায় খাবার দেওয়া হবে সেই সময় ডাইনিং রুমে চলে এসো এর মাঝে চাইলে তোমরা পুলেও নামতে পার।
পুলের কথা শুনে রোহান, ফাহাদ, টুকটুকি লাফিয়ে উঠল।তারা জিজ্ঞেস করল
-যতক্ষণ ইচ্ছা আমরা সুইমিংপুলে থাকতে পারব?
-হ্যাঁ পারবে তবে খাবার সময়ের আগে চলে আসবে। আর আজ বিকেলে আমরা একটা জোয়গায় যাব। স্যার আমাকে বলে দিয়েছে যাতে এই তিন দিন তোমাদের সব ভালো জায়গারগুলো ঘুরিয়ে দেখাই।
-আমরা কোথায় যাব?
-সেটা খাবার টেবিলে বসে আলোচনা করা হবে। এখন সবাই বিশ্রাম নাও।

যে যার ঘরে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েই পুলে চলে গেল। শুধু বেলী আর নীল বাদে সবাই গেছে। তারাও গেছে তবে পানিতে নামে নি। সেখানেও তাদের বেশ মজা হলো। খাবার সময়ে সকলেই সময়মতো ডাইনিং রুমে চলে এলো। ঠিক যখন সবাই গেছে তখনই আলাউদ্দিন সাহেব খাওয়া শেষ করে উঠেছেন। সকলকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলেন

-তোমরা খেয়েছো তো?

টুকটুকি বলল

-না আঙ্কেল এখন খাব।

-ঠিক আছে। সবাই খেয়ে জামালের সাথে ঘুরতে যাও। এই কয়দিন ওই তোমাদের ঘোরাবে।

এর মাঝে সবাই খাবার টেবিলে বসে গেল। অনেক রান্না হয়েছে। মুরগির মাংস, ইলিশ মাছ, অনেক রকম ভর্তা, ভাজি আরো কতো কি। সকলেই বসে গেছে খেতে। কেয়ারটেকার আঙ্কেল খাবার তুলে দিচ্ছেন। খাওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে জামাল সাহেব বললেন

-এখন খেতে খেতে সামনের তিন দিনের প্ল্যান করে নেওয়া যাক।

সকলেই তার কথায় হ্যা মেলালো

-আমাদের হাতে মোট তিন দিন সময় আছে। আজ বিকেলে কাছে ধারেই একটা জায়গায় যাব। আর কাল যাব একটা মেলা দেখতে। এখানের খুব বিখ্যাত মেলা, আমাদের রিসোর্ট থেকে বেশ দূরে তাও যাব। আর তার পরদিন যাব এখানকার বিখ্যাত একটা ঝরনা দেখতে, সব পর্যটকরাই এটা দেখতে যায়।

টুকটুকি জিজ্ঞেস করল

-আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি? মানে জায়গাটার নাম কি?

-আজ আমরা যার সোনাতলীতে। সেখানে অনেক রকম প্রাচীন জিনিস আছে। শুনেছি এই জায়গার জন্যই এখানের নাম সোনাপুর হয়েছে।

রোহান বলল

-আমরা কখন যাব।

-এইতো ৪/৫ টার দিক বের হবো। তার আগে তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে রেস্ট নায়ি নিও। এমনিতেও অনেক ধকল গেছে আজ সবার।

এসব বলতে বলতে জামাল আঙ্কেল এই জায়গাটা নিয়ে আরো অনেক ধারণা দিল। কথা বলতে সকলের খাওয়া প্রায় শেষ।

যে যার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিল। সকাল থেকে আসলেই বেশ ধকল গেছে তাদের উপর। দেখতে দেখতে তাদের সোনাতলী যাওয়ার সময় হয়ে গেল। তারা সকলেই ৪টার দিক তৈরি হয়ে গেল। তারা অবশ্য আজ বাসে যাবে না তারা যাবে বেশ বড় এক মাইক্রোতে। যেটা সব সময় এই রিসোর্টেই থাকে। সুভার বাবার ব্যবহারের জন্য। তারা মোট ৮ জন যাবে। তারা বন্ধুরা সাত জন আর জামাল আঙ্কেল, সেই গাড়ি চালাবে। সকলে গাড়িতে উঠে বসেছে। জামাল আঙ্কেলের পাশের সিটটা ফাঁকা কারণ সব বন্ধুরা এক সাথেই বসতে চায়। জামাল আঙ্কেলের পেছনের সিটে বাসছে সুভা, টুকটুকি, বেলী, আর তার পেছনে আকাশ, রোহান, নীল, ফাহাদ। পেছনটা অনেক চাপাচাপি হয়ে যাওয়ায় অর্ধেক যাত্রাপথে একজনকে বাধ্য হয়ে সামনে আসতেই হলো। অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো ফাহাদ সামনে বসবে। এবং সে সামনে বসে বুঝতে পারল সে কোনো ভুল করে নি। সামনে বসলে প্রকৃতিটা খুব সুন্দর ভাবে উপভোগ করা যায়। ফাহাদ সামনে বসে সকলকে লোভ দিতে লাগল। সামনে না বসায় কতো বড় ভুল করেছে সবাই সে বিষয়ে বোঝাতে গিয়ে সে সবাইকে এটা ওটা বলেই যেতে লাগল। মোটামুটি ৪০ মিনিটের মধ্যে তারা গন্তব্যে পৌঁছে গেল। সোনাতলীতে পৌছে তারা প্রথমেই দেখতে পেল সোনালী রঙে বিশাল বড় কিছু একটা স্তম্ভের মতো সেখানে লেখা 'সোনাতলীতে স্বাগতম ' লেখাটা দেখে মনে হয় সোনার উপর লেখা তবে জামাল আঙ্কেল বললেন এটা সোনার রঙ হলেও সোনা না।সোনা দিয়ে এটি করাতে গেলে কোটি টাকার বেশী লেগে যাবে। সোনাতলীতে ঢোকার পর ভেতরেই বড় একটা মাঠের মতো অংশ সেখানে কোথাও কোথাও গাছ, বিভিন্ন মূর্তি, ভাস্কর্য, স্তম্ভ ইত্যাদি। সব গাছের মধ্যে একটা গাছ সবার নজর কারল যেটা ছিল সম্পূর্ণ সোনালী। গাছের প্রত্যেকটা পাতা সোনার মতো তবে এটা নকল গাছ তাও দেখতে একদম সত্য সোনার গাছ। রোহান এর মাঝেই নিজের ক্যামেরা নিয়ে গাছের কিছু ছবি তুলে নিল। সেখানে কিছু কিছু ভাস্কর্য দ্বারা সোনাপুরের কিছু বিখ্যাত মানুষের কথা বোঝানো হয়েছে। জায়গাটা অনেকটা মিশরের মত। বইতে পড়া বিবরণ অনুযায়ী সকলের তাই মনে হল। শুধু এখানে গরমটা কম। সকলেই বেশ উৎসাহের সাথে সব কিছু দেখল। সন্ধার পর পরই তারা রওনা হলো। ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে যেতে যেতে সোনাতলি নিয়ে নানান কথা বলতে লাগল। ফেরার সময় আরো তাড়াতাড়ি ফিরতে পারল। তারা সকলেই বেশ ক্লান্ত। তাদের রিসোর্টে পৌঁছাতে রাত ৯টা বেজে যায়। যে যার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে ঠিক ১০ টায় খাবার ঘরে চলে আসে। আজ আর কেউ বেশী কথা বলছে না, কথা বলার শক্তিও নেই কারোর । সবাই খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পরল। তবে

আজ সবার ঘুমোনোর অবস্থাই ভিন্ন। পরিবেশ ভিন্ন হলে জীবনযাপনের পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। খুব শান্ত পরিবেশে নিজেকেও কেমন একটা শান্ত মনে হয়। তাদের ক্ষেত্রেও হয়তো তেমনটাই হচ্ছে। সবাই খুব সুশৃংখল ভাবে ঘুমিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে তারা ঘুমায়নি, ঘুমানোর অভিনয় করছে

•৪ জুন ২০১৫

পরদিন সবারই আগে আগে ঘুম ভাঙল। নতুন জায়গায় বোধ হয় ঘুম একটু আগে ভাঙে। সকলে যেই সময় উঠেছে তখন সম্ভবত ৭টাও বাজে না। সবার আগে উঠেছে নীল। বাড়িতে রোজই তাকে আগে আগে উঠে কাজ বাজ করতে হয়। তাই এখানে এসেও অভ্যাস টার ঠিক পরিবর্তন আনা যায় নি। এখানে কোনো কাজ না থাকায় প্রকৃতি দেখাটাকেই সে কাজ হিসেবে ধরে নিল। বারান্দায় বসে নীল বাইরেটা দেখছে। কি সুন্দর পরিবেশ। সামনে প্রায় কয়েক মাইল জায়গা ফাঁকা এরপর অনেক দুরে কিছু গাছ। কুয়াশায় পরিষ্কার দেখা যায় না। হাতের ডানেই চিকন একটা নদী বয়ে গেছে আর বামে রাস্তা। বারান্দার উপরটা ফাঁকা। দুফুট পর্যন্ত কাঠের একটু উচু অংশ। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার আছে। সব মিলে এক অসাধারণ পরিবেশ। এই পরিবেশে এক কাপ চা হলে পরিবেশের সৌন্দর্য হাজার গুণ বেড়ে যায়। নীলর খুব ইচ্ছে করছে কারো কাছে এক কাপ চা চাইতে কিন্তু চাওয়া হয়ে উঠল না। নীল অন্যমনষ্ক হয়ে কিছু ভাবছে। ভাবনার ব্যাঘাত ঘটলো কারো চিৎকারে। হঠাৎ ফাহাদ এসে চিৎকার করে বললো

-কিরে। এতো ভোরে উঠেছিস যে।

ফাহাদের কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হল নীল তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠায় পৃথিবীটা বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে বা নীল আগে ঘুম থেকে উঠে বড় কোন অন্যায় করে ফেলেছে। নীলের ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটানোতে সে খুব বিরক্ত হলো। তবুও স্বাভাবিক থাকার অভিনয় করে বলল

-আমি রোজ ভোরেই উঠি।

-কি সুন্দর লাগছে রে চারপাশটা, বাহ্ হেব্বি সুন্দর।

ফাহাদের এমন অদ্ভুত ভাষায় নীল আবারো বিরক্ত হলো। এত সুন্দর পরিবেশকে কেউ হেব্বি বলে আখ্যা দেয়? নীলের কাছে বিষয়টা খুব বেমানান লাগলো ।

ফাহাদ আবারো বলল

-তোর কি মন খারাপ নাকি?

-নারে।

-এমন চুপচাপ বসে আছিস যে তাহলে।
- বাবা-মাকে নিয়ে যদি কোনোদিন এখানে আসতে পারতাম।
একি নীল তো কথাটা মনে মনে বলছিল এটা মুখ দিয়ে বেরোলো কি করে। নীল খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গেল কথাটা ফাহাদের সামনে বলায়। এখন নিশ্চয়ই ফাহাদ ১০০ টা প্রশ্ন করবে তার বাবা-মায়ের বিষয়ে আর কলের পুতুলের মত সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে নীলকে। খুবই বিরক্তিকর অবস্থা
-আচ্ছা তোর বাবার কি কোনো খোজ পাসনি।
-না, অনেক খোজা হয়েছে।
-কি করে যে হারিয়ে গেল আঙ্কেল।
-বাবা বেঁচে আছে নাকি তাইতো জানি না।
-থাক এসব মনে করে আর কষ্ট পাস না।
-হম। তাই হয়ত ভালো।
-খুব জোর খিদে পেয়েছে। চল দেখি কোনো খাবার পাওয়া যায় কি না।
- তুই যা।
-ঠিক আছে। রোহান উঠলে ওকে নিয়ে আসবি।
-ঠিক আছে।
-সেতো আবার উঠেই গায়ে তেল মেখে মাঠে নামবে।
-কিসের জন্য মাঠে নামবে?
- আরে ব্যায়ামের জন্য।
ফাহাদের কথা শুনে মন খারাপের মাঝেও নীল হাসতে বাধ্য হলো। তাদের গল্প করতে করতে বেশ কিছুটা সময় চলে গেছে। তখন প্রায় সকলেই ঘুম থেকে উঠে গেছে। ৮ টার সময় তাদের সকালের নাস্তা দেওয়া হলো। নাস্তার টেবিলে গিয়ে সকলেরই বেশ মন খারাপ হলো কারণ জামাল আঙ্কেল প্রয়োজনীয় একটা কাজে ঢাকায় গেছেন। তার ফিরতে রাত হবে। আজ তাদের সবাইকে রিসোর্টে বসেই কাঁটাতে হবে। যেই মেলায় যাওয়ার কথা ছিল সেটা আর আজ হবে না। যদিও সুভার বাবা আছেন কিন্তু সে মেলা ঘুরিয়ে দেখানোর মতো মানুষ নন। তবে খুশির বিষয় হলো এই মেলা আরো ৫ দিন হবে। তাহলে তারা কালকেও যেতে পারবে। সকলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে সুভাদের ঘরে গেল। আজ দিনটা বন্ধুরা মিলে গল্প করেই কাটাতে হবে। এটাও মন্দ ব্যাপার না। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে দুপুর হয়ে গেল, এরপর সুইমিং পুলে গোসল, দুপুরের খাওয়া, বিকেলে আবার গল্প, খেলাধুলা এসব করতে করতেই সন্ধা। এর মাঝে সকলেই সুভার ফোন থেকে

তাদের বাড়িতে কথা বলে নিয়েছে, নীল ছাড়া কারণ তাকে নিয়ে চিন্তা করার মতো কেউ নেই। শুয়ে বসেই তাদের সোনাপুরের দ্বিতীয় দিনটা কাটল। জামাল আঙ্কেলকে ছাড়া তারা বাইরে যাওয়ার সাহসও দেখায়নি। প্রায় দশ টায় জামাল আঙ্কেল আসেন। এর মাঝে সকলে রাতের খাবার শেষ করে ঘরে চলে গেছে। এসব জায়গায় ঘুম তারাতাড়ি আসে আর ঘুম ভাঙেও তাড়াতাড়ি। জামাল আঙ্কেল রাতে এসে সবাইকে বলে গেছেন যে কাল সকাল ১০টায় তারা মেলার উদ্দেশ্যে বের হবে। সকলেই বেশ খুশি। রাতটা ভালো মতোই কাটল। সকালে সবাই ৭-৮ টায় উঠে গেছে। এবার শুধু বের হওয়ার অপেক্ষা। আজও তারা আগের দিনের মতোই গাড়িতে যাবে। সকলেই বেশ উত্তেজিত। কারণ এই মেলাটা সোনাপুরের সবথেকে ঐতিহ্যপূর্ণ একটি অংশ। যারা সোনাপুরে আসে মোটামুটি সবাই এই মেলার সময় আসে যাতে মেলাটা দেখে যেতে পারে। সকলে খাবার ঘরে এসে খাবার খাচ্ছে এবং সাথে সুভার বাবাও। তিনি এই প্রথম সবার সাথে খেতে বসেছেন। খাওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে সে জামাল আঙ্কেলকে বললেন

-আজ ওদের কোথায় নিয়ে যাবে?

-সোনাপুরের মেলায় স্যার, এখানে এসে এটা না ঘুরলে কি চলে।

মেলার কথা শুনে সুভার বাবার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য উনি থমকে গেলেন। জামাল আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন।

-কোনো সমস্যা স্যার?

-মেলায় যাওয়া যাবেনা

-কেন?

-আমি বলেছি তাই। ক্যানসেল কর আজকের প্ল্যান।

-স্যার আমি তো কাল টিকেটও কেঁটে ফেলেছি। -টিকিট ফেলে দাও।

বাচ্চারা সবাই চিৎকার করতে শুরু করল। তারা সকলেই থেকে যেতে চায় মেলায়। তারা কোনো ভাবেই আলাউদ্দিন সাহেবের কথা মানতে রাজি না। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি জামাল আঙ্কেলকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে গেলেন। আলাউদ্দিন সাহেব জামাল আঙ্কেলকে কি বলবেন তা কেউই বুঝতে পারছে না।

-দেখ জামাল, চারদিকে আমার অনেক শত্রু। আমি চাইনা আমার জন্য ছেলে-মেয়েদের কোনো ক্ষতি হোক। তা ছাড়া সোনাপুরে আমার বিজনেসের ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না। শুধু ঢাকার দিকটাই তুমি দেখ।বিজনেসের জন্য এখানে অনেকে আমার পিছে পরে আছে। তাও ওরা যখন যেতেই চাইছে তখন যাও।

কিন্তু একটা শর্ত আছে।
- কি শর্ত স্যার।
-ওদের নিয়ে মেলার বাইরে এক পাও দেবে না। সোজা মেলা থেকে রিসোর্টে ফিরবে।
-ঠিক আছে স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না।বাচ্চাগুলো খুব শখ করেছে মেলাটা দেখবে।খুব মন খারাপ হবে না নিয়ে গেলে। আমি ঠিক আপনার শর্ত মেনে ওদেরকে ঘুরিয়ে আনবো।
এই বলে জামাল চলে গেলেন। তবে সুভার বাবার মুখ থেকে এখনো চিন্তার ছাপটা যায়নি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ভয়ে আধমরা হয়ে আছে। সকলেই তৈরি হয়ে মেলার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছে। গাড়িতে যেতে যেতে তারা মেলার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনল। মেলাটা বেশ দূরে। তাদের যেতে প্রায় ৩ ঘন্টা সময় লেগে যায়। ঠিক ১টায় তারা মেলায় পৌঁছায়। খুব সুন্দর করে সাজানো সব। মেলায় ঢুকতেই বড় বড় করে লেখা 'সোনাপুর বড় মেলা" চারদিকে অনেক রকম আলো। মেলার গেটে তাদের সকলের টিকিট দিতে হলো। এর পর তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হলো। সকলেই ভেতরে ঢুকে অবাক। এতো বড় মেলা তারা আগে দেখে নি। মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সীমানা দেখা যায় না। হাজার হাজার দোকান। জামাল আঙ্কেল সকলকে বললেন
-আজ তোমাদের যা ইচ্ছে কিনতে পার। স্যার তোমাদের কেনাকাটার জন্য ২০ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে।
এতো টাকার কথা শুনে সকলেই বেশ অবাক হলো তবে সুভার বাবার কাছে এই টাকা সামান্য। নীল হঠাৎ ভাবল যদি সেও পারত এতো টাকা কামাতে। তাহলে আর মামির খারাপ ব্যবহার সহ্য করতে হতো না। সবাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। সকলেই এটা ওটা কিনল। যেমনঃ বেলী কয়েকটা বই নিল, আকাশ নিল একটা সুন্দর ছাতা, রোহান নিল ঠিক সত্যি দেখতে একটা দামি তলোয়ার। নীলকে অনেক জোর করার পরও সে কিছুই কিনতে রাজি হলো না। প্রায় ৩ টা বাজে। সকলেরই খিদে পেয়েছে। তারা বেশ বড় একটা খাবার হোটেলে গিয়ে খাওয়াটা সেরে ফেলল। খাবার মেনুতে ছিল পাবদা মাছ, মুরগির মাংস, চার রকমের ভর্তা, ডাল আর ভাত। এরপর আবার ঘোরাঘুরি। মেলায় নাগোরদোলা, চোরকি এমন অনেক কিছু ছিল। কোনো বস্তুই তাদের ৭ বন্ধুর হাত থেকে ছাড়া পায় নি, সব গুলোতেই তাদের ওঠা হয়েছে। প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য বুবিডুবি ভাব, মেলায় পুতুল

খেলা দেখানো হচ্ছে। শহরের ছেলেমেয়েদের কাছে এটা বেশ মজার বিষয়। তার সকলেই উৎসাহ নিয়ে দেখছে, খুব ভিড়। মুখের সামনে মানুষ পেরিয়ে পুতুল খেলা দেখতে হচ্ছে। নীল হঠাৎ খুব অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ করল। দুটো লোক এমন আবহাওয়ার

মধ্যে মুখে কাপড় পেচিয়ে আছে। বিষয়টা নীল রোহানকে ডেকে দেখাল। তারা এটা নিয়ে বেশ একটা হাসি তামাশা শুধু করে দিল। কোন এক কারনে নীলর তাদের প্রতি খুব উৎসাহ হচ্ছে। পুতুল খেলা থেকেও বেশি তাদের দেখাটাকে নীলের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। নীল লুকিয়ে তাদের দেখেই যাচ্ছে তবে লোকগুলো তা বুঝতে পারছে না। নীল কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখতে পেল লোকটার কোলে একটা বাচ্চা কিন্তু দু মিনিট আগেও তাদের কোলে বা পাশে কোনো বাচ্চা ছিল না। আর অবাক ব্যাপার হলো বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে। এই মেলায় এতো চেচামেচিতে কারো পক্ষে ঘুমানো সম্ভব না। বাচ্চাটার বয়স বেশী হলে ৫ বছর হবে। নীল অবাক হয়ে লোকগুলোকে দেখছে। ১ মিনিটের মধ্যে লোক দুটো বাচ্চাটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে মেলার থেকে বের হয়ে যেতে শুধু করল। নীলের খুব জানতে ইচ্ছে করছে সবটা। কোথাও কোনো একটা ঝামেল অবশ্যই আছে। নীল রোহানকে বলল

-রোহান আমার সাথে একটু আয়।

-কোথায়?

-আগে আয় পরে বলব।

এই বলে নীল রোহানকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। তারা দুজনেই লোক দুটোর পিছু নিয়েছে। তাদের দেখে রোহান বুঝে গেল নীলের তাকে নিয়ে আসার কারণটা।লোক দুটোকে দেখে খুবই ভয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। তারা যখন মেলার বাইরে যাওয়ার দরজা থেকে একটু দূরে, তখন বাচ্চা মেয়েটার ঘুম ভেঙে গেল। খুব অবাকভাবে বাচ্চাটা ছোটাছুটি করতে লাগল। তাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে তাকে জোড় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে লোক দুটো বাচ্চাটার হাত মুখ চেপে ধরে তাকে নিয়ে দৌড়ে মেলা থেকে বেরিয়ে গেল। নীল আর রোহানের বুঝতে বাকি রইল না যে বাচ্চাটাকে জোড় করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা দুজনও লোক দুটোর পিছু পিছু যেতে লাগল। তখন প্রায় সন্ধা। বাচ্চাটাকে নিয়ে তারা মেলা থেকে বেরিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে বাম দিকে একটা চাপা রাস্তায় ঢুকে পরল। রাস্তার সামনেই একটা গাড়ি রাখা। রোহানরা গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে। বাচ্চাটাকে কোনোমতে গাড়িতে তোলা হলো। নীল আর রোহানের রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছে। কি করা উচিত ওরা বুঝতে পারছে না। দৌরে গিয়ে ধরবে বাচ্চাটাকে? টেনে নিয়ে

আসবে কোল থেকে? নাকি আশেপাশের কাউকে ডাকবে? এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ তারা আবিষ্কার করল তারা আর তাদের মধ্যে নেই। তাদের চোখ বুজে আসছে, শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে।

চুপচাপ একটা পরিবেশ। আশপাশে কেউ নেই। হলুদ রঙের একটা বাতি জ্বলছে। বেশ বড় কাঠের একটা ঘর। নীল আর রোহান বুঝতে পারলো তাদের হাত দুটো বাধা। এতোক্ষণ ধরে কি হয়েছে তাদের কিছুই মনে নেই। নীল ততক্ষণে বুঝে গেছে তাদেরও ঐ বাচ্চা মেয়েটার মতো ধরে আনা হয়েছে। ঘরে কেউ নেই। নীল, রোহান দুজনেই চুপ, নীল কিছুক্ষণ পর বলল

-ওরা কেন আমাদের ধরে আনল।

-বুঝতে পারছিনা।

-আমরা কি করব এখন কিছু মাথায় আসছে না। ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে।

-আমাদের তো কোনো দোষ নেই। কেন মারবে।

-আমার খুব ভয় করছে।

কিছুসময় পরে তাদের ঘরে একটা লোক ঢুকল। লুঙ্গি পরা, খালি গা, বেশ মোটাতাজা, গায়ের রং কালো, পান চিবাতে চিবাতে সে নীলের দিকে এগিয়ে এসে বলল

-কিরে পোলাপাইন, নিজেগো খুব চালাক মনে করস?

-আপনারা কেন আমাদের ধরে এনেছেন?

-তোগোরে ধইরা আনার কোন ইচ্ছাই ছিল না আমগো। এট্টুক এট্টুক পোলাপান সাহস কত আমার লোকজনের পিছু নেস। এক থাপ্পর দিমু কানের নিচে।

এই বলে লোকটা হাত উঁচু করতেই নীল

আর রোহান কিছুটা পিছিয়ে গেল। সাহস সঞ্চয় করে নীল আবার বলল

-আপনারা ঐ বাচ্চাটাকেই বা কেন ধরেছিলেন।

-ঐ বাচ্চার সাথে তো এখন নিজেগো কপালও পুড়াইলি। এখন তোগো অবস্থাও ঐ বাচ্চাটার মতো হইবো।

-কি অবস্থা করবেন আপনারা বাচ্চাটার?

-বিদেশে পাচার কইরা দিমু। এর পর ঐখানে গিয়া কি হইবো হেইডা গেলেই বুঝবি তোরা

নীল আর রোহান বুঝতে পারছে তারা বিশাল বড় বিপদে পরেছে। তারা দুজনেই ভয়ে চুপ হয়ে গেছে। লোকটা তাদের বলল

-এখন খাইয়া ঘুমা। ভোর রাতে বিদেশে যাইবি ভালোমতো ঘুমাইয়া নে।
এই বলে লোকটা ঘর থেকে বের হয়ে গেল আর যেতে যেতে বলল 'রহমান ওগোরে খাবার দে" নীল কিছুক্ষণের জন্য আতকে উঠল নামটা শুনে। মুহূর্তের মধ্যেই তার মনে হল এত অবাক হওয়ার তো কিছু নেই এক নামের মানুষ তো থাকতেই পারে। লোকটা চলে যাওয়ার পর নীল আর রোহান চুপ করে বসে আছে। রোহানের হাতে ঘড়ি আছে। তবে হাত পেছনে বাধা থাকায় ঘড়ি দেখা যাচ্ছে না। নীল পেছন দিক তাকিয়ে দেখল ঘড়ির কাটায় ঠিক ০৮:৩০ বাজে। তাদের ভয়ে কথা বলার অবস্থাও নেই। প্রায় ১০ মিনিট কেটে গেল। পালানোর কোনো উপায়ও তাদের মাথায় আসছে না।এতোটুকু বয়সে এত বড় সমস্যা সামলাতে হবে এমনটা চিন্তাও করেনি ওরা। হঠাৎ দরজা দিয়ে একজন রোগা মতন লোকের প্রবেশ হলো। অন্ধকারে অতটা পরিষ্কার না দেখা যাওয়ার পরেও মোটামুটি বোঝা গেল এই লোকটা ও লুঙ্গি পড়া কিন্তু গায়ে একটা ফতুয়া আছে। চুলগুলো উস্ক খুস্ক। মোটামুটি কালো দেখতে, উচ্চতা মাঝারি। লোকটা নীল ও রোহানের দিকে খাবার হাতে এগিয়ে আসছে। কিছুটা এগিয়ে আসার পর নীলের লোকটাকে পরিচিত লাগতে শুরু করে। তবে সেটা নীল তার মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিল কারণ এই এলাকায় পরিচিত কারো মুখ দেখা প্রায় অসম্ভব। যখন লোকটা একদম নীলের সামনে চলে এলো কিছু সময়ের জন্য নীলের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। এই মানুষ টা যে তার খুব পরিচিত, রহমত। নীল বিশ্বাস করতে পারছে না তার চোখকে। এ কি করে সম্ভব। যেই মানুষটাকে এতো বছর খুজে পাওয়া যায়নি সে আজ তার সামনে। নীলের চোখ তার বাবাকে চিনতে ভুল করতেই পারে না। ছবিতে যেমন দেখেছে মানুষটা ঠিক তেমনই আছে। শুধু গায়ের রং টা আগে থেকে একটু বেশি কালো হয়ে গেছে। রহমত ওদের দিক খাবার ছুড়ে দিয়ে বলল
-নে খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।
-আপনার নামই রহমত?
- হ্যাঁ, কেন।
নীল কিছু বলতে পারছে না। পুরো পৃথিবীটা যেন ওলটপালট হয়ে গেছে তার। সে কি তাকে ডেকে বলবে বাবা তুমি কেমন আছো? কোথায় ছিলে এত বছর? কিন্তু যদি এই লোকটা তার বাবা না হয়, বাবা হবেনা তাই বা কি করে সম্ভব। এটাই তো তার বাবা। সে তো চিনতে পেরেছে। সে বুঝতে পারছে না রোহানের সামনে সবটা বলা ঠিক হবে কিনা। রহমত যখন চলে যাচ্ছে নীল তখন রোহানকে বলল

-তুই একটু অপেক্ষা কর আমি লোকটার সাথে কথা বলে দেখি কিছু একটা করা যায় কিনা।

নীল কথাটা বলেই তার বাবার দিক ছুটে গেল। ঘরটা বেশ বড় এক পাশ থেকে অন্য পাশে কথা শোনা যায় না। নীলের হাত পা কাপছে। সে দৌড়ে গিয়ে তার বাবার কাছে দাঁড়াল

-বাবা।

-কিসের বাবা, কে তোর বাবা।

-আমি তোমার ছেলে বাবা। তুমি আমায় চিনতে পারছো না?

- যা এখান থেকে বাজে কথা বন্ধ কর।

-বাবা আমি নীল। নানার কাছে শুনেছি নামটা তুমিই রেখেছিলে। মনে পরছে না বাবা?

নীলের বাবা কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। সে নীলের হাত ধরে তাকে টেনে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে গেল।ঘরটা এতক্ষণ কেউই খেয়াল করেনি। আশপাশে কেউ নেই। নীলের দিক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লোকটি

-আমার পুরো নাম বলতো?

-রহমত আলী

-তোর নানার নাম বল?

-মাহতাব হোসেন

-তোর বাবা কতোদিন হলো তোদের ছেড়ে এসেছে বলতো?

-১৫ বছর।

-তুই সত্যি আমার ছেলে নীল?

-হ্যাঁ বাবা। তোমায় চিনতে আমি ভুল করতে পারিনা। আমি তো বড় হয়ে গেছি তাই তুমি চিনতে পারছ না।

লোকটাকে এখন নীলের সব কথা বিশ্বাস করতেই হল। লোকটার চোখের কোনে এর মাঝেই পানি এসে গেছে।নিজেকে সামলে নিয়ে উনি বলল

-কেমন আছিস বাবা তুই। তোরা কেমন ছিলি এতোদিন আমায় ছাড়া? আর তোদের এখানে ধরেই বা এনেছে কিভাবে? তুই সোনাপুরেই কেন এসেছিস? নীলের বাবা নীলকে কোনো উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই নীলকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। নীলের চোখেও পানি। নীল সহজে কাঁদে না, সে কাঁদতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর নীলের বাবা তার দিক তাকিয়ে বলল

-তুইতো দেখতে অনেকটা আমার মতোই হয়েছিস রে।

-হ্যাঁ সবাই তাই বলে। আচ্ছা বাবা, তুমি কেন আমাদের ছেড়ে এসেছিলে? আর তুমি এখানেই বা কি করে এলে। এত খারাপ মানুষের মাঝে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নীলের বাবা চুপ করে আছে। কোনো উত্তর দিচ্ছে না। নীল আবার জিজ্ঞেস করল

-কি হলো বলো

-সে সব পরে বলব। আগে বল তোর মা কেমন আছে?

-তুমি কি কিছুই জানো না।

-কি জানব?

-বাবা...

-কি হলো বল। তোর মায়ের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য তো কতো টাকা পাঠালাম। ওকি এখনো সুস্থ হয়নি?

-কিসের টাকা পাঠিয়েছো বাবা? যেই মানুটা আর বেঁচেই নেই তাকে কি করে টাকা পাঠালে তুমি।

-কে বেঁচে নেই। মানে কি বলছিস তুই।

-মা আর নেই বাবা। আমাকে অনাথ করে দিয়ে চলে গেছে অনেক আগেই।

মুহূর্তের জন্য রহমত চুপ হয়ে গেলেন। স্ত্রী এর মৃত্যুর খবর শুনে যতটা কষ্ট তার পাওয়ার কথা কতটা সে পাচ্ছেন না। অনেক বছর দূরে থাকলে বোধহয় মায়াও কমে যায় বা রহমতকেরই মায়া কমে গেসে এই নরকে থাকতে থাকতে। সে অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই বলল

-তোর মার চিকিৎসার পরও কি করে এমন হতে পারে। ডাক্তার তো বলেছিল ঠিক মতো চিকিৎসা করালেই ও সুস্থ হয়ে যাবে।

-চিকিৎসার টাকাটাই তো জোগাড় হয়নি বাবা।

মুহূত্বের জন্য নীলের বাবা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তার মাথা কাজ করছে। তার মানে এতোদিনের সব কষ্ট মিথ্যে? যাদের সে ভালো রাখার জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছিল তারাই আজ ভালো নেই। রহমত আলী নীলের দিক খুব ভয়ের সাথে তাকিয়ে বলল

-তার মানে তোর মার চিকিৎসার জন্য, তোদের হাত খরচ চালানোর জন্য কেউ আমার নাম করে টাকা দেয়নি তোদের?

-মা যখন মারা যায় তখন আমি খুব ছোট। বড় হয়ে শুনেছি চিকিৎসার অভাবে মা মারা গেছিলেন। আর বুঝতে শেখার পর থেকে কেউ কোনোদিন টাকা দেয়নি বাবা। সকলে জানে তুমি নিখোজ, তুমি কেন আমাদের ছেড়ে এখানে এসেছো বাবা?

মিনিটের জন্য রহমর আলী থমকে গেলেন। তার চোখ থেকে পানি পরছে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছে না। তারা দুজনেই চুপ করে আছে। কিছু সময় বাদে রহমত আলী নিজেকে সামলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন

-তার মানে এতোদিন ওরা আমায় মিথ্যা বলেছে। যাদের জন্য এতো অপরাধ করেছি তাদেরই ভালো রাখতে পরলাম না।

-কাদের কথা বলছ বাবা?

-কাদের কথা বলছি তুই বুঝবি না। মানুষ রূপের কতোগুলো পশুর কথা।

-কে তারা? আর তুমি কেনই বা এতোদিন আমাদের কাছে আসোনি । জানো কতো কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে এতো দিন।

-তোর থেকে আর লুকিয়ে কি লাভ। সবতো শেষই। আমি তোকে সব বলব বাবা

-তাহলে বলো। আবার কেউ এসে পরবে।

-কেউ আসবে না। এই জায়গাটা রাতে আমিই পাহারা দেই। আর কেউ এখন আসবে না।

-তুমি এই খারাপ মানুষগুলোর হয়ে কাজ করো?

-হ্যাঁ

-কেন বাবা?

-বলছি, সব বলছি।

রোহান বুঝতে পারছে না নীল এতক্ষণ কি করছে পাশের ঘরটাতে। একা থাকার কারণে রোহানের ভয় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। এর মধ্যে ঘটলো আর এক ভয়ানক ঘটনা। কোথা থেকে ছোট্ট একটা ইদুর এসে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে। রোহানের ইচ্ছা করছে চিৎকার করে নীলকে ডাকতে কিন্তু সে ডাকছে না। সে চিৎকার চেঁচামেচি করলে কেউ যদি আবার এসে তাকে মারধর করে। রোহান পা দিয়ে কয়েকবার ইঁদুর টাকে লাথি মেরে দূরে সরানোর চেষ্টা করল কিন্তু ঘুরে ফিরে ইঁদুরটা আবার তার কাছেই আসছে। রোহান আর পারছে না, এবার ভয়ে তার মাথা ঘুরছে।

পাশের রুমে নীল আর রহমত মেঝেতে বসেছে। নীলের হাতের বাধা খুলে দিয়েছে তার বাবা। নীল এর মধ্যে ভুলেই গেছে রোহানকেও যে ধরে আনা হয়েছিল তার সাথে। এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে রোহানের কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক। নীল অপেক্ষা করে বসে আছে, এতদিনের না জানা সত্যিটা জানতে। নীলের বাবা আর অপেক্ষা না করিয়ে এবার বলতে শুরু করলো

-সময়টা ছিল তোর জন্মের ১ বছরের সময়। খুব অভাবে ছিলাম আমরা। তোর মায়ের চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার ছিল। একদিন রাতে আমি বেরিয়ে ছিলাম একটা কাজের খোজে। ঠিক রাত না সন্ধা হবে। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল তোর মাকে বাচানোর জন্য। সেদিন বেরিয়ে আমি গেছিলাম আমার সবথেকে পরিচিত এক বন্ধুর কাছে। তার থেকেই কাজের খবরটা পেয়েছিলাম। তার নাম ছিল সাগর, সাগরকে সবটা বলার পর সে আমায় বলল সে আমায় টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে তবে তার জন্য আমারা একটা বে আইনি কাজ করতে হবে। প্রথমে না করলেও টাকার কারণে আমি রাজি হয়ে যাই। তবে সেদিন ও আমায় বলে নি কি সেই কাজ। আমায় নিয়ে গেল একজন লোকের সাথে দেখা করাতে। ঐ দিন আমি প্রথম সোনাপুরে পা রেখেছিলাম। সেই লোকটার সাথে দেখা করালো যার মাধ্যমেই এই বেআইনি কাজ হয়। লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া ছিল, মুখে দাড়ি-গোঁফ, সুট-কোট পরা। আমায় দেখে সে বলল

-এখানে কাজ করার আগে কাজটা জেনে নাও। তবে এখানের কাজটা জানার আগে তোমায় নিশ্চিত হতে হবে যে তুমি কাজটা করবে।কারণ একবার সবটা জেনে গেলে তোমার আর আমরা ছারতে পারব না

-জ্বি আমি করব। আমার শুধু টাকার প্রয়োজন, তার জন্য আমি সব করতে পারব।

-তবে শোনো, আমাদের এখানে তোমার কাজ হবে এখানকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখে রাখা। এসব ছেলে মেয়েদের দিয়ে কি হয় সেটা তোমার জানার দরকার নেই। শুধু এতটুকু জেনে রাখ তোমাকে মাসে লাখ টাকা দিতে কিছুই আসবে যাবে না আমার। তবে যদি একটা ছেলে মেয়েও পালায় তাহলে তুমি টাকা তো পাবেই না উলটো তোমার পরিবারকে আমি শেষ করে দেব।

কথাগুলো শোনার পর অনেক ভেবে আমি রাজি হয়ে যাই। তারা আমায় বলে আমার পরিবারের সব খরচ তারা চালাবে। আমাকে সেই পশুটা বলেছিল আর কোনোদিন আমার পরিবারের কাছে যেতে পারব না। টাকার জন্য তাও মেনে নিয়েছিলাম। এখানে কাজ করার ১ বছর পর আমাকে বলা হয় তোর মা সুস্থ হয়ে গেছে। তারা নাকি তোর মাকে বলেছিল যে আমি খুব বড় একটা চাকরি করি। কাজের জন্য আর আসতে পারি নি তবে সময় মতো আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। তোর মাও নাকি সবটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ঐ জানোয়ারগুলো আমায় সব মিথ্যা বলেছে। মিথ্যা বলে বলে এতোদিন আমায় এখানে বেঁধে রেখেছে।

রহমান আলী কথা শেষ করার আগেই কাঁদতে শুরু করল। নীল বলল

-কেন টাকার জন্য এসব করেছো বাবা। তুমি আমাদের পাশে থাকলে আমরা এমনিতেই হয়ত ভালো থাকতাম।
-আমি বুঝতে পারিনিরে বাবা। আমায় ঐ লোকটা এভাবে ঠকাবে। শুধু মাত্র তার জন্য আমার সব শেষ হয়ে গেল। আর আমি বুঝতেও পারিনি অবৈধ কাজ মানে বাচ্চা পাচার করার মত নোংরা কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি আমি।
-কে সেই লোক যার জন্যে আমি আমার মা বাবা সবাইকে হারালাম। কে সে?
-তুই কি করে চিনবি তাকে। সেই অমানুষ টার নাম আলাউদ্দিন।
নীলের পায়ের নিচের মাটি সরে গেল কথাটা শুনে। সে কিছু বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাও খুব কষ্ট করে বলল
- আলাউদ্দিন সাহেব? তার পরিবারে কে কে আছে বাবা?
- তার একটা মেয়ে আছে। তোরই মতন বয়স। তার পরও জানোয়ারটার একটুও মারা হলো না আমার সন্তানের ওপন এমন অন্যায় করতে। আল্লাহ যেন ওর মেয়ের উপর ও এমন অবিচার করে।
-তার মেয়ের নাম সুভা। তাইনা বাবা?
-তুই কি করে জানলি?
-অনেক কিছুই কাকতালীও ভাবে জানা যায় বাবা।
-কি করে জানলি বল আমায়।
-সব বলব পরে। এখন এসব বলার সময় না। বাবা আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। আমার বন্ধুকে তার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। আমি আর ফিরে যাব না রিসোর্টে।
-কিসের রিসোর্ট?
-সব পরে বলব। বাবা আমি আর তোমায় এখানে থাকতে দেব না। আমরা দুজনে চলে যাব অনেক দূরে।
-ওরা আমায় ছাড়বে নারে।
- আমরা পালিয়ে যাব। কেউ জানবে না। কিন্তু তার আগে রোহানকে রিসোর্টে পৌছে দিতে হবে।
-কিন্তু কি করে সম্ভব ?
-সব সম্ভব। শোনো তুমি আমাকে আর রোহানকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আর তুমিও এখান থেকে পালাবে কাউকে না বলে। এর পর আমি রোহানকে রিসোর্টে রেখে দিয়ে ভোর রাতে ওখান থেকে পালিয়ে আসব। তারপর আমি আর তুমি অনেক দূরে চলে যাব বাবা।

-ঠিক আছে বাবা। কিন্তু আলাউদ্দিন যদি একবার জানতে পারে আমাদের দুজকেই শেষ করে দেবে।
-কিছু করতে পারবে না। সে জানলেও আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না কারণ আমার ক্ষতি করলে তার খুব কাছের কেউ কষ্ট পাবে।
-মানে কি বলছিস এসব?
- সে সব পরে বলব। এখন আমাদের বের হওয়ার ব্যবস্থা করো আর তুমিও এখান থেকে পালিয়ে বাস স্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। ভোর রাতে এখান থেকে ঢাকায় বাস যায় শুনেছি। আমি সময় মতো চলে আসব।
-ঠিক আছে চল এখন।
এই বলে রহমান আলী রোহান আর নীলকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত দিয়ে এলো। রাত্রে এখানে রহমান আলী ছাড়া আর কেউ পাহারায় না থাকায় খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না ওদেরকে বের করতে। রোহান যাওয়ার সময় নীলকে জিজ্ঞেস করল
-কি এমন বললি লোকটাকে যে আমাদের পালাতে সাহায্য করছে?
-সব সকালে বলব। এখন চুপচাপ চল।
নীল জানে সকালে সে কিছুই বলতে পারবে না। রোহানকে এই মিথ্যে না বলে থামানো ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। নীল তার বাবাকে বলে রেখেছিল যাতে রোহানের সামনে তার আর তার বাবার সম্পর্ক নিয়ে কিছু না বলে। বড় রাস্তার পর থেকে নীল চিনতে পারবে। রাত তখন ১১:০০ টা।রাস্তায় লোক অনেক কম। বড় রাস্তা পর্যন্ত তাদের একটা বাসে যেতে হয়েছে এর পর হেঁটে যাওয়া যায়। পুরো বাস্তায় আর কেউ কোনো কথা বলেনি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে তারা রিসোর্টে পৌঁছায়। সবাই ডাইনিং রুমে বসে আছে। কারো চিন্তায় ঘুম নেই। তারা ঢুকতেই সকলে প্রায় তাদের দিক ঝাপিয়ে পরল। এটা ওটা নানান প্রশ্ন করছে সবাই। জামাল আঙ্কেল ভয়ে প্রায় অর্ধমৃত হয়ে আছেন। নীলের কানে কারোর কোনো প্রশ্ন ঢুকছে না। সে শুধু তাকিয়ে আছে আলাউদ্দিন সাহেবের দিকে। লোকটার মুখে অদ্ভুত একটা ভয়। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে তার লোকেরাই নীলদের ধরে নিয়ে গেছে বা নাও বুঝতে পারে। নীলের খুব ইচ্ছে করছে সুভাকে সবটা বলবে কিন্তু মেয়েটা সহ্য করতে পারবে না আর অলোউদ্দিন হয়তো টাকে আর তার বাবাকে মেরেই ফেলবে। নীল কারো প্রশ্নের উত্তর দিল না শুধু বলল 'সব সকালে বলব" এই বলে নীল ঘরে চলে গেল। এর পর রোহান কিছু বলেছে কিনা তা নিয়ে নীলের মাথা ব্যাথা নেই।

ঘরে কেউ নেই, আকাশ, ফাহাদ, রোহান সকলে নিচে। নীল আজকের ঘটনাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বাবাকে ফিরে পাওয়ার খুশিটা নীল বুঝতে পারছে না। সব কিছু খুব অদ্ভুত লাগছে তার। কেনই বা সুভার সাথে তার দেখা হলো, কেন তারা সোনাপুরে আসল, কিভাবে তার বাবার সাথে দেখা হলো, সবকিছু খুব অবাক লাগছে নীলেব। সবটাই কেমন অসম্ভব, অদ্ভুত, কাকতালীও। নীল আর কয়েক ঘন্টা পর চলে যাবে। সে ঠিক করেছে কাউকে কিছু বলবে না। শুধু সুভার জন্য একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে। এর মাঝে রোহান আর ফাহাদ ঘরে এসেছে। এসেই নীলকে নানান প্রশ্ন করতে লাগল। নীল কোনো জবাব দিল না। সে আবারো বলল ‘সকালে বলব সব, তোরা প্লিজ ঘুমিয়ে পর। আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করিস না” এই বলে নীল বারান্দায় চলে গেল। তখন প্রায় ০১:০০ টা। নীল বারান্দায় বসে আছে। তার মনে অনেক রকম অনুভূতি। কষ্ট, খুশি, লজ্জা, অভিমান, অপরাধবোধ সবকিছু কেমন একটা গুলিয়ে গেছে। মাথায় অনেক চিন্তা ঘুরছে তার। সুভার সাথে আর দেখা হবে না, মামির সাথে মামার সাথে কারো সাথে আর দেখা হবে না, তার ঘরে আর ফিরে যাওয়া হবে না। নীল অনেক্ষণ চুপচাপ বারান্দায় বসে আছে। দেখতে দেখতে ঘরির কাঁটায় ০২:০০ টো বেজে গেল। সকলে ঘুমিয়ে গেছে। নীল তার খাটে বসে ব্যাগ থেকে কাগজ আর একটা কলম বের করল। সুভার উদ্দেশ্যে লিখতে শুরু করলঃ-

চিঠিটা সকলের জন্যই লিখছি তবে মূলত সুভার জন্য। ২৮সুভা না থাকলে হয়তো আজ আমার সোনাপুরে আসা হতো না। আমার জীবনটাও হয়তো বদলে যেতো না। সুভা, তুই খুব ভালো একটা মেয়ে। আমি তোকে সত্যটা বলতে পারছি না। মনের মধ্যে কেমন একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। তুই যেদিন সব সত্য জানবি সেদিন তোর জীবনটা পুরো বদলে যাবে। আমায় ক্ষমা করিস সবটা না বলতে পারার জন্য। শুধু একটা কথা জেনে রাখ অনেক মানুষের উপরটা সুন্দর হয় কিন্তু ভেতরে ঘন কালো, মেঘের মতো কালো। আমি তোকে কষ্ট দিতে চাইনা তাই সব বললাম না। যদি আবার কোনোদিন কাকতালীও ভাবে দেখা হয় তখন হয়তো বলব। আমি চলে যাচ্ছি। তোদের সবার থেকে অনেক দূরে। এখানে এসে আমি আমার ভবিষ্যত খুজে পেয়েছি। কোথায় যাব জানি না। তবে যেখানেই যাই নিশ্চই ভালো থাকব। তোদের সাথে হয়তো আর দেখা হবে না। তোরা ভালো থাকিস। আর মামিকে বলিস আমি নিজের জীবন নিজেই খুজে নিয়েছি। মামি এতে খুশিই হবেন। যাই হোক, তোদের সকলকে খুব মনে পরবে তাও আমায় আজ যেতেই হবে।

ইতি ’নীল’

লেখাটা শেষ করতে অনেক সময় লেগে গেল তার। সে জানে না সুভাকে সব কিছু না জানিয়ে সে ঠিক করল কিনা। তার পক্ষে এতো কঠিন সত্য কিছুতেই বলা সম্ভব না। প্রায় ০৩ঃ০০ টা বেজে গেছে। আর কিছুক্ষণ পর সে তার বাবার কাছে যাবে। মনে একটা অদ্ভুত খুশি, সব কিছু গুছিয়ে প্রায় ০৩ঃ৩০ এ নীল বেরিয়ে গেল। দারোয়ান ঘুমিয়ে থাকায় বের হওয়াটা সহজ হয়ে গেল।আজকে কেন জানো সব কিছু সহজ ভাবে হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় যেতে যেতে নীল অনেক কিছু ভাবল। মনের মধ্যে কেমন একটা শান্তি কিন্তু সুভার জন্য নীলের খুব খারাপ লাগছে। মেয়েটা হয়তো জানেও না কি করে তার বাবা এতো টাকার মালিক। নীল আর তার বাবা কোথায় থাকবে না থাকবে সেসব কিছুই তারা জানে না। তবে যেখানেই যাক হয়তো ভালোই থাকবে। বেশ কিছুক্ষণের মাঝে নীল তার বাবাকে দেখতে পেল। রহমান আলী বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। নীল তার পাশে এসে বসল। দুজনেই চুপ, কেউ কোনো কথা বলছে না। এই নিঃশ্বব্দ পরিবেশে ঝড়ের মতো করে একটা বাস আসল। দুজনে বাসে উঠে একদম সামনের একটা সিটে বসল। গন্তব্যহীন এই যাত্রার শেষ কোথায় কারো জানা নেই। বাসে লোক কম। হালকা বাতাস। নীল তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। বাবার পাশে বসে থাকার অনুভূতিটা নীল এই প্রথম পেল। তাদের ভবিষ্যত কেমন হবে তারা জানে না। আবার কোনোদিন সুভার সাথে দেখা হবে কিনা তাও সে জানে না। তারা দুজনেই এগিয়ে চলেছে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

•২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

মিউনিক শহরে বাঙালি রেস্তোরাঁ কমই আছে। হাতে গোনা কয়েকটা। এখানে তো আবার বাঙালি রেস্তোরা ছাড়া বাইরে খাওয়া দাওয়া করা খুবই ঝামেলার বিষয়। নীলের বাইরে খেতে হলে ওই হাতে গোনা কয়েকটা রেস্তোরাঁর মধ্যেই খেতে বসে সে। আজও তাই করেছে। দুপুর পার হয়ে গিয়েছে, অফিসের এত কাজের চাপ ছিল যে খাওয়ার সময়টুকু পাওয়া যায়নি। এমন সময় রেস্তোরায় বসে না খেয়ে উপায় নেই। নীল বেশ কিছু খাবার অর্ডার করে দিলে। এদিকে বাঙালি খুব একটা দেখা যায় না তাই বাংলা রেস্তোরাঁ গুলো ফাঁকাই থাকে। আজ খিদেও পেয়েছে প্রচুর। এর মধ্যেই তার খাবার চলে এলো। খাবার আসার সাথে সাথে নীল খেতে আরম্ভ করল। সারাদিন প্রচুর ব্যস্ততা গেছে তার সারাটা সকাল ক্লাস, এরপর অফিসের কাজ তাও যদি কাজে থাকে অতিরিক্ত চাপ। তবে এত ব্যস্ততা থাকলেও নীল এখন ভালো

আছে, অনেক ভালো আছে সে। খেতে খেতে অনেক কিছু নিয়ে ভাবছিল নীল। তার খাওয়া প্রায় শেষ। সে ভাবলো একটা কফি অর্ডার করে দেওয়া যাক। সে ওয়েটারকে ডেকে একটা ক্যাপচিনো দিতে বলল। মাথাটাও বেশ ধরেছে। কফি খেলে মাথাটাও হয়তো ছাড়বে একটু। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পানি খেতে খেতেই তার কফি চলে এলো। কফিতে প্রথম চুমুক টা দিতেই মাথাটা খুলে গেল। মনে হচ্ছে পুরোটা শরীরের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। বিকেল হয়ে এসেছে প্রায়। তবে রোদের তাপটা এখনো কমে নি। এর মাঝেই একটা মেয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। নীল পেছন থেকে মেয়েটাকে দেখলো। তার চুল প্রায় কোমর সমান। শাড়ি পড়েছে মেয়েটা, নীল শাড়ি। পিছন থেকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে, কয়েক সেকেন্ড তাকানোর পরেই চোখ সরিয়ে নিল নীল। নীল শুনতে পাচ্ছে মেয়েটা অর্ডার করলো একটা চিকেন চিজ বার্গার আর একটা অরেঞ্জ জুস। হঠাৎ করে নীলের কিছু একটা মনে হতেই সে আবার পেছন ঘুরে তাকালো। নীল তাকাতেই এবার মেয়েটা নীলের দিকে মুখ ঘোড়ালো। দুজনেরই চোখে চোখ পড়েছে এবার। স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে তারা। কতগুলো বছর পর সেই পরিচিত মুখ

-নীল?

-তুই এখানে

-আমি কি ঠিক দেখছি? তুই কি নীল না?

-তুই..

-সুভা, চিনতে পারছিস না তাইতো। চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

-মা, মানে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে তুই কি..কি করে?

-এই প্রশ্নটা তো আমিও তোকে করতে পারি।

-আচ্ছা এদিকে আয় আগে বোস। বসে কথা বলি।

সুভা নীলের টেবিল টা তে গিয়ে বসলো। দুজনেই খুব অবাক ভাবে বসে আছি। তারা হয়তো কখনো কল্পনাও করেনি আবার তাদের দেখা হবে। কি দিয়ে কথা শুরু করবে তারা কেউই বুঝতে পারছে না। বয়স বেড়ে যাওয়ায় দুজনের মধ্যেই জড়তার এসে গেছে অনেক। জড়তা কাটিয়ে উঠে নীলই আগে জিজ্ঞেস করলো

-বল এবার। জার্মানিতে তুই কি করছিস? কবেই বা এলি। এত বছর ধরে এখানে থাকি, তোর সাথে আগে তো কখনো দেখা হলো না।

-আমি এসেছিই কয়েক দিন হল। বেড়াতে এসেছি কিন্তু ভাবতেও পারিনি বেড়াতে এসে এত বিস্ময়কর একটা কাহিনী হয়ে যাবে।

-কত বদলে গেছিস রে তুই। চিনতেই পারিনি তোকে দেখে।

-সময়ের সাথে সবাইকেই বদলাতে হয় কিন্তু তুই একটুও বদলাসনি। দেখতে সেই আগের মতই আছিস। শুধু একটু দাড়ি গোঁফ হয়েছে, আর চোখে চশমা লাগিয়েছিস, এই যা।
নীল হালকা হেসে দিয়ে বলল
-তুই কি একাই এসেছিস?
-হ্যাঁ রে। একাই ঘুরে বেড়াই এখন সব জায়গায়। এবার তোর কথা বল। তুই এখানে কিভাবে। এতগুলো বছর পর...
-সে অনেক লম্বা ঘটনা।শুনতে শুনতে তোর রাত পার হয়ে যাবে
-আমার হাতে অনেক সময়। সন্ধ্যার আগে বাসায় যেতে হবে এমন কোন বাধা ধরা নিয়ম আমার নেই। জানিসই তো।
কথাটা শেষ হতেই দুজনেই হেসে উঠলো
-ঠিক আছে চল এখান থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও বসে ঘটনা বলব।

তারা দুজনেই একটা পাহাড়ের মত জায়গায় এসে বসলো। জায়গাটার একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। মাঝখানের দিকটায় রাস্তা চলে গেছে একপাশে হালকা পাহাড়ের মত অন্যপাশে বড় খাদ। রাস্তাটার যে পাশে খাদ সেদিকে রাস্তা বরাবর বেশ কিছু বেঞ্চ দেওয়া। ওখানে চাইলেই বসা যায়। বেঞ্চগুলোতে বসে সামনের দিকে তাকালে মনে হয় খাদের উপর মেঘগুলো ভাসছে। দুপুরের চড়া রোদটা পড়ে এসেছে । তারা দুজনে গিয়ে বসল একটা বেঞ্চে। বসেই বেশ কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ। তারা চুপ করে পরিবেশটা উপভোগ করছিল। এরই মাঝে সুভা একটা ফ্লাক্স বের করে। ফ্লাক্স থেকে কিছু একটা বের করে দুটো ওয়ান টাইম কাপে ঢালে সে। একটা কাপ এগিয়ে দিল নীলের দিকে। নীল কোন কথা না বলে কাপটা নিয়ে নিল । কাপের চুমুক দিতেই নীল কিছুটা অবাক হল। সে আশা করেছিল সুভা এখনো ক্লাস ভর্তি চা রাখে। কিন্তু এটা চা না, কফি। তাও খুবই কম চিনি দেওয়া। তেতো তেতো লাগছে খেতে। নীল কোন কথা বলল না। চুপচাপ খেতে শুরু করল।
-তারপর বল..দিনকাল কেমন চলছে?
-এই চলছে পড়াশোনা, কাজ, রান্নাবান্না সবকিছু মিলে যেমন চলতে পারে আর কি?
-তা তুই কি জার্মানিতে পড়তে এসেছিস নাকি?
-হ্যাঁ হুট করেই সব হয়ে গেল। বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে পারবো, সেই আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। এইচএসসি পর্যন্ত অনেক কষ্ট করেছি। বাবার তো এমন পরিস্থিতি ছিল যে কোন কাজবাজও করতে পারছিল না। বাবা বাড়ি থেকে বের

হলেই একরকম আতঙ্ক কাজ করতো। তার উপর শরীরটাও ভালো যেত না। আমি ওই টিউশন করে ছোটখাটো কাজ করে লেখাপড়াটা কোনো মতো চালিয়েছি। এইচএসসি দেওয়ার পরে প্রায় এক বছর বসেই কাটিয়েছি পড়াশোনা হবে না ধরেই নিয়েছিলাম। এরপরে হুট করে দেশের বাইরে পড়াশোনা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। অনেক ঘাটাঘাটির পরে কয়েকটা স্কলারশিপেও এপ্লাই করলাম। কোনটাই হচ্ছিল না। তারও প্রায় ছয় মাস পরে হুট করে জার্মানিতে একটা স্কলারশিপ হয়ে যায়। সবকিছু বদলে যায় তারপর থেকে। এইতো এখন এখানে দিব্যি চলছে সবকিছু। ভালোই আছি সব মিলে বুঝলি।

-বাবা মানে। তুই কার কথা বলছিস নীল?তোর বাবাকে কি খুঁজে পেয়েছিস?

মুহূর্তের জন্য নীল নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভুলেই গেছিল সুভা তার বাবার কথা জানে না। কিন্তু নীল তো একটা চিঠি লিখে এসেছিল সুভার জন্য। সেই চিঠিটাতে পরিষ্কারভাবে তার বাবার কথা না বলা থাকলেও যদি চিঠিটা সত্যিই সুভা কোনদিন পড়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কিছু না কিছু ধারণা করত বা এখন সেই বিষয়ে নীলকে জিজ্ঞেস করতো। তার মানে কি সুভা কখনো চিঠিটা পড়েনি? পায়নি সে চিঠিটা?

-কি হলো নীল বল? তোর থেকে অনেক কিছু জানার আছে আমার। তুই কেন সেদিন ওভাবে কাউকে না বলে রিসোর্ট থেকে চলে এলি? কোন যোগাযোগ করলি না আর। অনেক প্রশ্ন জমে আছে এতগুলো বছর ধরে আমার মনে। আজকে সবকিছুর উত্তর দিতে হবে তোকে।

নীলের খুব বলতে ইচ্ছে করছে চিঠিটার কথা। কিন্তু সে বলতে গিয়েও আটকে গেল।

-সব সময় তো সব কিছু বলে করার পরিস্থিতি থাকে না। আর বাবার কথা জিজ্ঞেস করছিলি তো? হ্যাঁ আমি আমার বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। অনেক কষ্টের পর খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে। তাই তখন আর কাউকে কোন কিছু বলে আসার প্রয়োজনও মনে করিনি।

নীলের মনের মধ্যে হঠাৎ একটু খারাপ লাগলো তার মনে হচ্ছে সে বুঝি সুভার সাথে খারাপ ব্যবহার করল। আসলেই এভাবে বলা ঠিক হয়নি মেয়েটাকে। সেই ছোট থেকেই সুভা তাকে সাহায্য করেছে। সারা জীবনের জন্য চলে যাওয়ার সময় সেই মানুষটাকে বলে আসেনি নীল। অবশ্যই তার অন্যায় হয়েছে কিন্তু সে তো চিঠি লিখে এসেছিল। হয়তো আলাউদ্দিন সাহেব চিঠিটা সরিয়ে ফেলেছিল আগে থেকেই। সেই বিষয় নিয়ে কথা বলে আর বাড়াতে চায় না নীল। নীল দেখতে পেল

মেয়েটার সত্যি মন খারাপ হয়েছে। চুপ করে আছে সে। কফির কাপের দিকে তাকিয়ে কফির নড়াচড়া দেখছে।
-কিরে রাগ করেছিস।
-ধুর না, কিসের রাগ। তোর বাবাকে তুই খুজে পেয়েছিস এটা তো আমাকে জানানোর মতো কোন বিষয় না।
-দেখ বিষয়টা এরকম না। আমি খুব বাজে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম তোকে জানানোর হয়তো জানিয়েও ছিলাম কিন্তু তুই জানতে পারিস নি।
-থাক কিছু জিনিস না জানাই ভালো।
-তারপর তোর কথা বল। এখানে কি জামাইকে নিয়ে এসেছিস নাকি?
-আরে ধুর একাই এসেছি আমি।
-ওমা একা কেন একা একা এভাবে ঘোরা যায় নাকি।
-কেন যাবেনা, একা ঘোরার অন্যরকম মজা আর এখন একা কোথায় এই যে তোকে পেয়ে গেলাম।
-তা অবশ্য ঠিক।
-আর এখন তো একা না ঘুরে উপায়ও নেই। কে আর ঘুরবে বল আমার সাথে ছোটবেলার সব বন্ধুরা এখন যে যার মত ব্যস্ত। কারোরই এখন সময় হয় না কারো সাথে ঘোরার। আর বড় হওয়ার পরে যেই বন্ধুদের পেয়েছি তারা সব নামের বন্ধু মাত্র। তার থেকে ভালো একাই ঘুরে বেড়াই। জানিস ইউরোপের ৫ টা দেশ ঘোরা হয়ে গেছে আমার জার্মানি নিয়ে ছয়টা হবে। এশিয়ার মধ্যে তো জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এগুলোতে গিয়েছি। জানিস মালদ্বীপ যাওয়া খুব ইচ্ছে আছে ভাবছি নেক্সট টুরটা মালদ্বীপেই প্ল্যান করব।
-বাহ তা তো খুব ভালো। যাবি ঘুরে আসবি।
নীলের হঠাৎ খুব জানতে ইচ্ছে করলো আলাউদ্দিন সাহেবের কথা। কেমন আছে ওই লোকটা, খারাপ মানুষেরা যদিও ভালোই থাকে। নীল একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল
-তোর বাসার সবাই কেমন আছে?
-বাসার আবার সবাই কোথায়। আমি আর বাবা ছাড়া কেই বা ছিল বাড়িতে।
-ওই তো তোর বাবা কেমন আছেন?
-বাবা গত বছর মারা গেছেন। হয়তো ভালোই আছেন ওই পারে।

-কি বলছিস কিভাবে মারা গেলেন উনি? উনার মত এত প্রভাবশালী একজন মানুষ এভাবে মারা গেলেন এটা মেনে নিতে পারছি না।
-প্রভাবশালী হলেও তো মৃত্যুকে আটকানো যায় না। মৃত্যু তার সময় মত ঠিক চলে আসে যতই ক্ষমতার জোর থাকুক না কেন। এক্সিডেন্ট হয়েছিল বাবার। কখনো তো গাড়ি নিয়ে একা বের হয় না। সেদিন কি মনে করে একাই বেরিয়েছিলেন। জামাল আঙ্কেল এত যেতে চাইলেও তাকে সাথে নেন নি। কে জানে হয়তো এভাবেই মৃত্যু লেখা ছিল তার কপালে।
হঠাৎ করে নীলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো কিন্তু নীলের তো এরকম লাগার কথা না। যেই লোকটা মারা গেছে তাকে তো নীল খুবই অপছন্দ করে। সে তো নীলের জীবনটা শেষ করে দিয়েছে তাহলে কেন তার মৃত্যুর খবর নীলকে এত কষ্ট দিচ্ছে। খারাপ মানুষের মৃত্যুর খবর পেলেও বোধ হয় ভালো মানুষদের কষ্ট হয়। নীল মনে মনে একবার আলাউদ্দিন সাহেবের আত্মার শান্তি কামনা করে নিল।
-এই কয়টা বছরের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেছে জানতেও পারলাম না।
-কিছু জিনিস না জানাই ভালো। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আর কথা না বলি?এত সুন্দর একটা জায়গায় ঘুরতে এসেছি এখন মন খারাপ করতে চাচ্ছি না। বাদ দে এসব।
-ঠিক আছে। তুই যেমন বলবি। তা উঠেছিস কোথায়? মানে কোন হোটেলে?
-যেখানেই হোক না কেন কিন্তু তোর এই সিটিতে না। আমি বার্লিনে উঠেছি একটা হোটেলে, এখানে এসেছি একটু ঘুরতে ভাবলাম এই সিটিটাও দেখে যাই। মিউনিক থেকে চলে যাব আজই। তার পরদিনই বাংলাদেশের ফ্লাইট।
-আজি চলে যাবি? এতদিন পর দেখা হল কটা দিন থাক না এখানে বেশ কিছু ভালো ভালো ঘোরার জায়গা আছে, তোকে ঘুরিয়ে দেখাবো। তুই বার্লিনের হোটেলটা ক্যান্সেল করে দে। কালকের দিনটা অন্তত থাক এখানে।
-ধুর বোকা এভাবে বললে হয় নাকি, আমার সব জিনিসপত্র ওখানে আছে। হোটেল ক্যানসেল করে দিলে আমার জিনিসপত্রগুলো ওরা ছুঁরে বাইরে ফেলে দেবে। আর এত চিন্তা করছিস কেন পৃথিবীটা তো এইটুকু। দেখলি না কিরকম অদ্ভুতভাবে দেখা হয়ে গেল আজ আমাদের এভাবেই আবার কোন সময় দেখা হয়ে যাবে।
নীল এমন বোকা একটা কথা বলার জন্য নিজেই বিব্রত হয়ে গেল। সে মুচকি একটা হাসি দিয়ে মাথা নিচু করে ফেললো। তাদের দুজনেরই কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, কফির সাথে কথাও বলার শক্তিও যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। দুজনেই আরো

অনেক কথা বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুজন অতঃপর সুভা আবার বলল
–আচ্ছা একটা কথা বলি যদি তোর অসুবিধা না থাকে তোর ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতে পারিস?তোর তো আবার হুট করে হারিয়ে যাওয়ার স্বভাব, ফোন নাম্বারটা থাকলে হারিয়ে গেলেও খুঁজে পাবো।

নীল কোন কথা না বলে নিজের ফোনটা বের করল। বের করে সুভার নাম্বারটা লিখে নিয়ে সুভা কে একটা ফোন দিতেই তার ফোনটা বেজে উঠলো। সুভা অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ফোন বাজার শব্দ তার কানেই আসছে না। সুভার মাথায় অনেক কথা ঘুরছে, একটা সময় কতই না পাগলামি করত ওরা বন্ধুরা মিলে আর আজ নীলের কাছে একটু ফোন নাম্বার চাইতেই কত ইতস্তত করতে হলো সুভাকে। এভাবেই সম্পর্ক গুলোর দূরত্ব বেড়ে যায়, বন্ধুত্বগুলো হারিয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার আগে বাড়ি যেতে হবে এমন কোন বাধাধরা নিয়ম তো তার নেই কিন্তু তারপরেও কেন জানি তার আর থাকতে ইচ্ছা করছে না আজ। বাড়িতে গিয়ে চুপ করে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে।

•২৫ জুন ২০২১
রহমত আলী রাতের রান্না বসিয়েছেন। একা থাকলে রান্না করে খেতে ইচ্ছে করে না। দুপুরে গতকালের বাসি খাবার খেয়েছিলেন তাই রাতে রান্না করতে হচ্ছে আজ। নীল চলে যাওয়ায় একা একাই থাকতে হয় তাকে এখন এই এক কামরার ঘরে। প্রথম কিছুদিন খুব বেশি কষ্ট হলেও এখন আর অত কষ্ট হয় না তার। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আজ শরীরটা ভালো না রহমত আলীর। শরীরে যে কি সমস্যা হল সেটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু খুব দুর্বল লাগছে। তাদের বাড়িটা খুব নিরিবিলি একটা জায়গায়। সোনাপুর থেকে আসার পর যত সম্ভব লোকালয় থেকে দূরে থাকতো তারা। কখন আবার কে জানি খুঁজে পেয়ে যায়। এই ভয়ে নিরিবিলি জায়গায় থাকতেই বেশি পছন্দ করেন রহমত আলী। মেইন রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট লাগে। এরপরে যে গলিটা চোখে পড়ে সেই গলিরও একদম শেষ মাথায় তাদের বাড়ি। ওই রাস্তায় শুধু দুটোই বাড়ি একটা রাস্তার মাঝের দিকে আরেকটা একদম শেষ মাথা। চেচামেচি করলেও শোনার মত মানুষ নেই। বা অন্য কারো চেঁচামেচিও কানে আসে না। বাড়িটা টিনের না, কিন্তু একতলা, কয়েকটা

রুম পরপর। প্রতিটা রুমে আবার আলাদা করে রান্নাঘর আর বাথরুম আছে এটা খুব সুবিধা। হিসেব মতো এই বাড়ির ভাড়া আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত কিন্তু মেইন রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে দেখে ভাড়াও খুব কম। রহমত আলী রান্না করছিলেন এমন সময় কেউ দুমদুম করে ধাক্কা দেয় তার ঘরের দরজায়। এমন সময় কে আসলো। এখন যে দরজা খুলতে গেলে মাছটাও পুড়ে যাবে খুবই বিরক্ত হলেন তিনি। চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা খুলতে যাবেন ঠিক তখনই আরো জোরে দুমদুম করে দুবার ধাক্কা দিলো। খুবই বিরক্তির সঙ্গে রহমত আলী দরজাটা খুললেন। মুহূর্তের জন্য তার পুরো শরীরের রক্ত হিম হয় গেল।

-আপনি এখানে?

-কিরে ভেবেছিলি পালিয়ে বেঁচে যাবি?

-আপনি আমার বাড়ির ঠিকানা পেলেন কি করে?

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আলাউদ্দিন সাহেব বললেন

-পৃথিবীটা খুব ছোট রে। এত সহজে পালানো যায় না। তুই তো জানিস আমি কেমন মানুষ। কোন কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য দুনিয়া উল্টে দিতে পারি।

-আপনি একদম ঘরের ভেতরে ঢুকবেন না বেরিয়ে যান বলছি।

-আরে দাঁড়া দাঁড়া। এতদিন পরে দেখা হল একটু চা খাওয়াবি না।

-দেখেন ভাই। আপনার সাথে আমার এত কথা বলার দরকার নাই আপনি এমনিতেই আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছেন। মিথ্যাবাদী, ঠক সারাটা জীবন মিথ্যা বলে আমাকে আটকে রেখেছিলাম। কি ভেবেছিলেন আমি কোনদিন জানতে পারবো না।

-তা ভেবেছিলাম। হুট করে তোর ছেলে যে উদয় হবে তা তো আর আমি জানতাম না। বিষয়টা তো সম্পূর্ণ কাকতালীয় ছিল।

-এত কথা বলার কোন দরকার নাই, আপনি এই মুহূর্তে আমার বাসা থেকে বের হন।

-হবো না বের, কি করবি?

রহমত আলী রাগ চোখে তাকিয়ে আছে আলাউদ্দিন সাহেবের দিকে। তার ইচ্ছে করছে আলাউদ্দিন সাহেব কে মেরে ফেলতে। কিন্তু তা সে করতে পারবে না।

-আপনাকে আমি কিছুই করতে পারবো না আমি জানি সেটা। তাই দয়া করে আপনাকে বলছি এখান থেকে চলে যান আমার জীবনে আর ঝামেলা বাড়াবেন না।

-তোর ছেলেটা কোথায় রে। তাকে তো দেখছি না। খুব সেয়ানা হয়েছে তোর ছেলে আবার আমার মেয়ের জন্য চিঠি লিখে এসেছিল। তোর ছেলের সাহস দেখে আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম।

এই বলে আলাউদ্দিন সাহেব এক গাল হেসে দিল।

-কিরে বল ছেলে কোথায়?

-ও দেশে নেই

-ওমা দেশে নেই মানে? গেছে কোথায়?

-পড়াশোনা করতে গেছে।

-বাব্বাহ! তোর ছেলের আবার পড়াশুনা। যদিও শুনেছি সে পড়াশোনায় খুব ভালো।

-আপনি কেন এসেছেন এখানে? কি উদ্দেশ্যে?

-উদ্দেশ্য তো ওরকম কোনো নেই আমার। শুধু জানতে এলাম কেন আমার পিছে লাগলি?

-আপনার পিছে লেগেছি মানে?

-মানেটা তুই বল তুই যদি আমার পিছে নাই লাগবি তাহলে তুই আমার ওখান থেকে পালিয়ে আসার পরপরই পুলিশ কি করে জানতে পারল আমাদের কাজের কথা? পুলিশকে সামলানোর জন্য কি কি করতে হয়েছে আমার জানিস? সারা জীবন আমার নুন খেয়ে আমারই সর্বনাশ করলি।

-আমি কিছু করিনি। কাউকে কোন কিছু জানাইনি আমি।

-একদম মিথ্যা কথা বলবি না। সময় থাকতে স্বীকার কর।

-আপনি আমাকে বিশ্বাস না করলে আমার কিছু করার নাই। কিন্তু আমি কাউকে কোন কিছু জানাইনি।আপনার ওখান থেকে চলে আসার পর আমি সবকিছু থেকে দূরে সরে গিয়েছি। যাতে কেউ আমাকে খুঁজে না পায় সেই জন্য এরকম একটা জায়গায় এসে রয়েছি। পুলিশদের আপনার আস্তানার খবর দেবো সেই সাহস আমার নাই। যদি থাকতো তাহলে অনেক আগেই দিয়ে দিতাম খবর।

রহমত আলীর কথা শেষ হতেই আলাউদ্দিন সাহেব তার শার্টের কলার চেপে ধরল।

-সত্যি করে স্বীকার কর রহমত। তোকে আজকে জানে মেরে ফেলবো আমি।

-ছাড়েন আমাকে, খবরদার গায়ে হাত দিবেন না। যা আমি করিনি আমি স্বীকার করব কিভাবে।

এর মাঝে তাদের মধ্যে একপ্রকার ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। এমন সময় রহমত আলী নিজেকে বাঁচানোর জন্য আলাউদ্দিন সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতেই আলাউদ্দিন সাহেবের মাথাটা গিয়ে পড়ল একটা কাচের টেবিলের ওপর। যে

টেবিলের একটা কোনা এর মধ্যেই ভাঙ্গা ছিল। সেখানে তার মাথাটা লেগে চোখের পলকেই রক্তাক্ত অবস্থা হয়ে গেল। রহমত আলী কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আলাউদ্দিন সাহেবের হাঁপানির টান উঠে গেল। তিনি অনেক আগে থেকেই অ্যাজমা নামক একটি রোগে ভুগছেন। সময়মতো ইনহেলার না নিলে তার শ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। একদিকে মাথা থেকে রক্ত পড়ছে, আরেক দিকে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ইনহেলার টাও সে গাড়িতে ফেলে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যেই আলাউদ্দিন সাহেব মাটিতে পড়ে দাপাদাপি করতে লাগলেন। রহমত বুঝতে পারছে না সে কি করবে। সে কি গিয়ে দুজন লোককে ডেকে আনবে? নাকি নিজেই নিয়ে যাবে আলাউদ্দিনকে ডাক্তারের কাছে? রাতও যথেষ্ট গভীর হয়েছে। রহমত আলী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তার একটুও কষ্ট হচ্ছে না মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার জন্য। কিন্তু রহমত আলী তো এত খারাপ মানুষ নন। একজন মানুষ তার চোখের সামনে পড়ে মারা যাচ্ছেন আর সে তাকে বাঁচানোরও চেষ্টা করছেন না। রহমত আলীর মনের মধ্যে একরকম পৈশাচিক আনন্দ হতে লাগলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, এর মত অমানুষের মরে যাওয়াই ভালো। আরো অনেক কথা ঘুরছে তার মাথায়। কোন কিছু ভাবার আগেই সে দেখতে পেল। লোকটা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে নড়াচড়া করছে না আর। উনি কি মরে গেলেন? নাকি অভিনয় করছেন?

আলাউদ্দিন সাহেব গাড়িটা রহমত আলীর বাসার একটু পাশেই রেখেছিলেন। রহমত আলী বাসা থেকে বেরিয়ে দেখে এসেছেন গাড়িটা কোথায় রাখা আছে। রাত প্রায় এগারোটা পার হয়ে গিয়েছে। রহমত আলী শারীরিকভাবে চিকন হলেও শক্তি কম নয়। কিন্তু সে মোটেও আশা করেননি আলাউদ্দিন সাহেবের মত এত ভারী শরীরে একজন ব্যক্তিকে সে নিজে তুলে নিয়ে যেতে পারবে। খুব কষ্ট হলেও টেনে হিচড়ে শরীরটাকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন তিনি। তাকে বসালেন গাড়ির ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে। আর রহমত আলী বসেছেন ড্রাইভিং সিটে। তিনি টুকটাক ড্রাইভিং জানেন। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূর। জায়গাটা তিনি নিজেও চেনেন না। কিন্তু দেখে মনে হল জায়গাটা খুব নিরিবিলি এখানে কেউ সচরাচর আসেনা। তিনি গাড়ি থেকে নেমে জায়গাটা একটু দেখে নিলেন। এরপর আবার গাড়িতে উঠলেন। খুবই ভয় করছে তার অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছেন তিনি। বোধ হয় আলাউদ্দিন সাহেবের থেকেও বড় অন্যায়। ভয়ে তার এমন ভাবে হাত পা কাঁপছে যে গাড়ির স্টিয়ারিং টাও ধরে রাখা যাচ্ছে না। সে খুব কষ্টে গাড়িটাকে একটা গাছের সাথে মিলিয়ে দাঁড় করালেন। কিভাবে কি করবেন অনেক আগেই ভেবে ফেলেছেন

তিনি। ভাবনামতই গাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। গাড়িটা পুড়ে যাচ্ছে সাথে আলাউদ্দিন সাহেবের শরীরটাও। রহমত আলীর এখন অনেক রাস্তা পার করে বাড়ি যেতে হবে। আসার সময় তো গাড়িতে এসেছেন কিন্তু এখন পায়ে হেটে যেতে হবে। তার খুবই ঘুম পাচ্ছে ইচ্ছা করছে এখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। নিজেকে অমানুষ বলে মনে হচ্ছে তার। একটা মানুষকে মেরে ফেলে, পুড়িয়ে দিয়ে এখন আবার তার ঘুমোতে ইচ্ছা করছে। সে কি আসলেই অমানুষ হয়ে গিয়েছেন?হয়তো হ্যাঁ, এতগুলো বছর অমানুষের পাশে বসবাস করলে মনুষ্যত্ব ধরে রাখা যায় না। এখন বাড়ি যেতে হবে গিয়ে খুব লম্বা একটা ঘুম দিতে হবে।

•২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

রাত ৯ টায় সুভার ফ্লাইট। নীল এসেছে সুভাকে বিদায় জানানোর জন্য। ৭ টার মধেই তারা এয়ারপোর্টে এসে পড়েছে। ২ ঘন্টা সময় আছে তাদের হাতে। সময় কাটানোর জন্য তারা হাটাহাটি করছে। অন্ধকারে লাম্পপোস্টের হলুদ আলো গুলোর কারনে তাদের ছায়া রাস্তায় পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে।

-তুই এতো কষ্ট করে বার্লিনে না আসলেই পারতি।

-ধুর কিসের কষ্ট। ছোট থেকে তুইও তো আমার জন্য কম কষ্ট করিস নি। এ আর এমন কি কষ্ট।

সুভা মৃদু হাসল।

-তুই কি আর দেশে ফিরবি না?

-জানি নারে। বাবা কে ছেরে কখনো দেশের বাইরে আসব তাই তো ভাবি নি কিন্তু আসতে হলো। কবে যে যেতে পারব তার ঠিক নেই।

-হুম...তোকে কিন্তু চশমায় খুব মানিয়েছে। এখন একদম ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট লাগছে।

-চশমার যে কতো জ্বলা পরতে হলে তবে বুঝতি।

কথা বলতে বলতে কখন ১ ঘন্টা পার হয়ে গেছে তারা টেরই পায়না। নীল তার হাত ঘরিটার দিক তাকিয়ে সময় খেয়াল করল।

-তোর তো ফ্লাইটের বেশি দেরি নেই।

- হুম দেখেছি। যেতে ইচ্ছা করছে নারে। মন চাচ্ছে এখানেই থেকে যাই।

-তা কি করে হয় বল।

-তাই তো।

-কিরে মন খারাপ?

-একদমই না। কোনদিন দেখেছিস আমাকে মন খারাপ করতে?
-কতোটুকুই বা দেখেছি তোকে আমি।
-আচ্ছা নীল একটা কথা বলি?
-হ্যাঁ বলনা।
সুভা কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। অনেক সময় মনের মধ্যে হাজার কথা থাকলেও মুখে বলা যায়না। সুভা নিচে তাকিয়ে তাদের দুজনের ছায়া দেখছে। বাহ্ কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের ছায়া ২টো কে। তাদেরকেও কি পাশাপাশি এমন সুন্দর দেখায়? দূর থেকে একটা ছবি তুলে দেখতে পারলে ভালো হতো। সুভা একদম অন্যমনস্ক হয়ে আছে। কল্পনার জগতে তলিয়ে যাচ্ছে সে।
-কি হলো বল? কি একটা বলবি বলছিলি।
-উমহু কিছুনা। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার যাওয়া উচিত তা না হলে ফ্লাইট মিস করব।
-হুম চল।
তাদের ২ জনেরই মনটা খারাপ। কেউই তা প্রকাশ করছে না। এতো বছর পর ২ বন্ধু এক হলো অথচ একটা সপ্তাহও সময় পেল না তারা এতো বছরের জমানো গল্প গুলো শেষ করার জন্য। যতই এয়ারপোর্টের দরজার সামনে এগিয়ে আসছে তারা ততই মন খারাপটা বেড়ে যাচ্ছে। সুভা এক্ষুনি চলে যাবে। তারা অনেকক্ষণ ধরেই চুপ করেছিল। অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করলেও কেউ কোনো কথা বলছিল না। নীরবতা ভেঙে সুভাই বলল
-যাই রে। মাঝেমধ্যে মেসেজ করিস। যদি কখনো দেশে আসিস দেখা করবি কিন্তু।
-ঠিক আছে। তুই সাবধানে যাস। পৌঁছে জানাস আমাকে।
-আচ্ছা। আসি হ্যাঁ?
-এমন ভাবে বলছিস যেন থেকে যেতে বলেই থাকবি।
-বলার মত করে বললে হয়তো ঠিকই থাকতাম।
এই বলে সুভা একগাল হেসে নিল। নীলও হালকা হাসতে হাসতে তার চশমাটা একটু ঠেলে উপরে ওঠালো। সুভা পেছন ঘুরে এয়ারপোর্ট এর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক দরজার সামনে গিয়েই পিছন ঘুরে আবার তাকানো সুভা। নীলের দিকে তাকিয়ে হালকা একটা হাসি দিল। কিন্তু নীল হাসতে পারল না। এতক্ষণ নীলের তেমন একটা খারাপ লাগে নি কিন্তু এখন খুব খারাপ লাগছে। নীল হালকা করে হাত নাড়ল। সুভা এয়ারপোর্টের দরজাটা পার হয়ে গিয়েছে। অনেক দূর চলে গিয়েছে ও। নীল সুভাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। নীল দাড়িয়ে আছে একা একা। তার মনটা

খুব খারাপ। তবে এতো মন খারাপ হওয়ার মতোও কিছু হয় নি। সুভার সাথে এতো বছর পর দেখা হলো এটা তো একটা খুশির বিষয়। কয়েকটা ঘন্টা তো কাটানো গেল ওর সাথে এই খুশিতেই না হয় বিদায় এর দুঃখটা ভোলা যাক। নিজেকে এমন অনেক কিছু বলে সান্তনা দিচ্ছে নীল। কিন্তু যত যাই হোক প্রিয় মানুষগুলোকে বিদায় দেওয়া সত্যি অনেক কষ্টের। নীল হঠাৎ খেয়াল করল। তার মাথার উপরে একটা তারে একটা কাক বসে আছে। আজকাল তো কাক খুব একটা দেখা যায় না। কোথা থেকে এলো এই কাকটা?

কাক টাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারও ভীষণ মন খারাপ। নীলের পরক্ষণেই মনে হলো কাকেরও আবার মন খারাপ হয় নাকি?হতেই পারে। মানুষের মন খারাপ হতে পারলে কাকের কেনো পারবে না। নীল কাকটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দিল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো কাকটা বুঝি তার মন খারাপের ভাগ নিতে এসেছে। নীল আর বেশি কিছু না ভেবে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। কাল সকালে আবার ক্লাস আছে, দুপুরে অফিস। হাজারো মন খারাপের পরেও এভাবেই কাটতে থাকবে ব্যস্ততম জীবনের প্রতিটা দিন।